coop

2025

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫ বিশেষ সংখ্যা

সমবায়

সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

মুনিমা হাফিজ
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি

মোঃ আহসান কবীর
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

মুহাম্মদ হোসেনুজ্জামান
উপনিবন্ধক (পিপি)

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী নিবন্ধক (পিপি)

ফাহমিদা আক্তার লীমা
সম্পাদক ও সদস্য সচিব

মূল্য

২৫ টাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

মনিরুল ইসলাম

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : +৮৮০ ২২২২-২৪৮০৫৩, ৪৮১১১৮০৫, ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.coop.gov.bd, ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

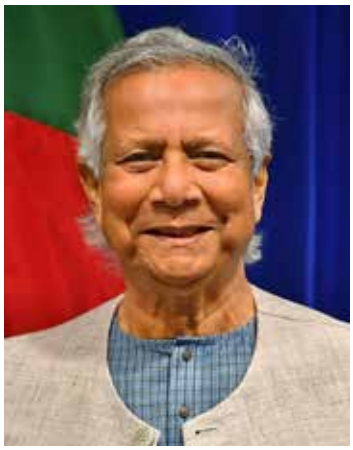

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

“সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ০১ নভেম্বর, ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সকল সমবায়ী ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশ ও জনগণের উন্নয়নে গৃহীত যে কোনো কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সামাজিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত অপরিহার্য। সমবায়ের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ কাজটি আমরা অনায়াসে করতে পারি। সমবায় সমিতিগুলো শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয় বরং সমাজের নানাবিধ সমস্যা দূর করতে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনের বিকল্প নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে চায়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সমবায় খাতকে আধুনিক ও গতিশীল করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, সঞ্চয় ও ঋণদান ও কুটিরশিল্পসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। আসুন, সমবায়ের চেতনাকে ধারণ করে সাম্য ও সমতায় আমরা সকলে মিলে গড়ে তুলি নতুন বাংলাদেশ।

আমি “৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০২৫” উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

আজ ১ নভেম্বর ২০২৫, সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য- "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"- বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ঘোষিত গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।

সমবায় এমন এক আন্দোলন, যা মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থা ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বৈষম্য হ্রাসে সমবায় একটি কার্যকর মাধ্যম। সমবায়ের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে- একতা, সহযোগিতা, সততা, আস্থা, সেবা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার- যা একটি বৈষম্যহীন, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অপরিহার্য।

দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতি সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে পুঁজিতে রূপান্তর করে বিনিয়োগ, ঋণদান, আবাসন, পুষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম" শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের সেবাসমূহ ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে, যার ফলে অনলাইনে সমবায় সমিতি নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সেবা এখন আরও সহজলভ্য হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় আইন যুগোপযোগী ও হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারি বৈষম্যহীন, আত্মনির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সাথে সকল সমবায়ীদের কাজ করে সমবায় আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং দেশব্যাপী সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

আজ ১লা নভেম্বর, ২০২৫ দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় সমবায় দিবসের এ শুভক্ষণে উষ্ণ অভিবাদন জানাচ্ছি। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন একটি পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যার বিস্তৃতি রয়েছে গ্রামীণ জনপদে, নগরজীবনে এবং সমকালীন বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে। "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়" এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবোধক বাক্যটি একটি দেশ ও সমাজ গঠনের মৌলিক দর্শনকে তুলে ধরে। সাম্য বলতে এখানে সুযোগ ও মর্যাদার সমতা বোঝায়, আর সমতা বলতে বোঝায় সম্পদ ও ক্ষমতার সুষম বণ্টন। এই দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে সমবায় ব্যবস্থা একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল, সামাজিকভাবে সুসংগঠিত এবং নৈতিকভাবে উন্নত করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১,৭৪,৯৩০টি সমবায়ে প্রায় ১৫,৯৫,৭৪২ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সকল সমবায়ের কার্যকরী মূলধনের পরিমান ৩৮ হাজার ১০৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরের সকল সেবা ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে "সমবায় মডেল গ্রাম পাইলট প্রকল্প" এবং দুধের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের ৫০টি উপজেলায় "দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন একটি জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৭৩ সালে দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় স্থাপন করা হয়। শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়-এর মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গোবাদীপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। ৩,৮৫৮টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ১,৪৩,১৯২ জন সদস্য সংখ্যাসহ প্রায় সাড়ে ১০ লাখ সুফলভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিল্কভিটার সাথে জড়িত। বছরের প্রায় ৫(পাঁচ) লক্ষ লিটার কাঁচা দুগ্ধ সংগ্রহপূর্বক পাস্তুরাইজড করে ২২টি দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস ও কৃচ্ছতা সাধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসায় নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ দাদন ও আদায় করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ আগষ্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতা গণআন্দোলনের পর নারায়ণগঞ্জস্থ বিএসবিএল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স অবৈধ দখলমুক্ত হওয়ায় এ ব্যাংক আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং বিএসবিএল এর নিয়ন্ত্রণে ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমবায় হলো সেই সেতুবন্ধন, যা ব্যক্তিকে সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করে। শোষণহীন, বৈষম্যহীন এবং সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অন্যতম মাধ্যম সমবায়। তাই দেশ গড়ার সমবায়ী এ দর্শনকে আজ অধিকতর গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে আমরা একটি সাম্য, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গড়ে উঠা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারি।

আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস সফল ও সার্থক হোক এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মোঃ ইসমাইল হোসেন)

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়' যা সময়ের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সমবায় মানে হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। একক ব্যক্তির সীমিত সামর্থ্যকে যখন অনেক মানুষের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে সমর্থন দেওয়া হয়, তখন গড়ে ওঠে সমবায়। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক সংগঠন নয়, এটি এক ধরনের সামাজিক দর্শন, যা মানুষকে শেখায় একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা।

"সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"- এই শ্লোগানটি শুধু একটি বাক্য নয়, এটি বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এক অনন্য অঙ্গীকার। সমবায়ের মূল দর্শন হলো সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সম্মিলিত স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে রাখা। এখানে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই এক সমান অধিকার ভোগ করে। সমবায় ব্যবস্থা মানুষকে শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করে এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বৈষম্য একটি বড় সমস্যা। কেউ অনেক সম্পদশালী, আবার কেউ জীবিকা নির্বাহ করতেই হিমশিম খায়। সমবায় এই বৈষম্য কমাতে পারে। সমবায়ের প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী বিনিয়োগ করে এবং লাভ ভাগাভাগি করে নেয়। এতে ধনী-গরিব পার্থক্য দূর হয়। তাছাড়া সমবায় খামার, দুগ্ধ সমবায়, ক্ষুদ্র শিল্প সমবায় ইত্যাদির মাধ্যমে বহু মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। সম্মিলিত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনার ফলে দরিদ্র মানুষও আয় বৃদ্ধির সুযোগ পায়।

সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১,৭৪,৯৩০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে প্রায় ১৫,৯৫,৭৪২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করছে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত উপকারভোগীদের মাঝে ঘূর্ণায়মান আবর্তক তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করার মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সম্মিলিত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনার ফলে দরিদ্র মানুষও আয় বৃদ্ধির সুযোগ পায়। সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(মুনিমা হাফিজ)

সূচি

- সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায় : মুনিমা হাফিজ ১১
- পাঁচসাধু ও সমবায়পাঠ : বাদল সৈয়দ ১৫
- আগামীর বাংলাদেশ : জেন জি ও সমবায়ের নতুন স্বপ্ন : সোহেল নওরোজ ১৯
- কৃষি সমবায়ের সাফল্যগাথা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : ড. জাহাঙ্গীর আলম ২১
- পেশাগত প্রশিক্ষণের ভূমিকা ও তাৎপর্য : কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহমেদ ২৫
- বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির বাস্তব চিত্র, ঝুঁকির কারণ বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি থেকে উত্তরণের উপায় : জেবুন নাহার ২৮
- সাম্য ও সমতার বাংলাদেশে সমবায়ের কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর : হরিদাস ঠাকুর ৩৪
- চীনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ উপলক্ষ্যে, ICA-AP-ACFSMC : কর্মশালার কিছু অভিজ্ঞতা : মোঃ সাহাদৎ হোসেন ৩৮
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষি সমবায় নীতি, এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ : ড. আব্দুল্লাহেল বাকী ও ড. রাজেশ চক্রবর্ত্তী ৪০
- বৈষম্য থেকে সমতায়, মানবিক অর্থনীতির সন্ধান : খ. ম. রেজাউল করিম ৪৪
- মিতব্যয়ী মানুষেরা গরিব হয় না : এমদাদ হোসেন মালেক ৪৭
- জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, সমবায়ের ছোঁয়ায় তৃণমূল মানুষের সমৃদ্ধি: রাফায়েল পালমা ৪৯
- ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ যুগোপযোগীকরণ প্রস্তাব: মোঃ মোখলেছুর রহমান ৫৩
- সিঙ্গাপুরের সমবায় আন্দোলন, বাংলাদেশের জন্য একটি অনুসরণীয় মডেল : সাইয়্যেদাতুন নেছা ৫৬
- গরুর খামারী হওয়া কি লাভজনক? এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সর্বশেষ আপডেট কী? : তোফায়েল আহমেদ ৬১
- সমবায় সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতা : খোন্দকার হুমায়ূন কবীর ৬৪
- একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় শক্তিতে অনুপ্রাণিত একটি প্রতিষ্ঠান: সামিয়া সুলতানা ৬৬
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমবায় : সাম্যের টেকসই পথচলা : মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার ৬৯
- LDC থেকে উত্তরণে সমবায়ের ভূমিকা : আইনিন নাঈম ফিমা ৭৩
- মিল্কভিটা: সমবায় অঙ্গনে উজ্জ্বল নক্ষত্র: মুহাম্মদ মকবুল হোসেন ৭৭
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও সমবায়সমূহে তার প্রয়োগ : সৈয়দ জসীম উদ্দিন ৮১
- যশোরের ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির 'গাছি বাড়ি' : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ৮৫
- চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা: মোঃ রনি মিয়া ৮৮

সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০২৪-২৫)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা
১. সমবায় সমিতির সংখ্যা	১১	১,২২১	১,৭৩,৬৯৮	১,৭৪,৯৩০

২. সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট সদস্য (সমবায়ী)
	৯২০৬৮৭৩	৩১,৮০,৩৪৩	১,২৩,৮৭,২১৬

৩. সমবায় সমিতির মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
ক. শেয়ার মূলধন	৬,০৪৯.৩৯	১৪,৩৮৭.৫১	৩,৩২,৬১২.৭২	৩,৫৩,০৪৯.৬২
খ. সঞ্চয় আমানত	৭৭০.১৫	১,৯৫,০৮২.৩৯	২৫,৯১,৮০৫.৬০	২৭,৮৭,৬৫৮.১৪
গ. সংরক্ষিত তহবিল	৩৫,৩৯৬.১১	২৬,০৭৯.০৭	৯৭,৬৮৮.৭০	১,৫৯,১৬৩.৮৮

৪. সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
কার্যকরী মূলধন	৭৩,৯৯৬.০৭	৩,৮০,২০৩.২৫	৩৩,৫৬,৫৮২.৫৬	৩৮,১০,৭৮১.৮৮

৫. সমবায় সমিতির সম্পদ (লক্ষ টাকায়)

ভৌত সম্পদ	বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ	মজুদ তহবিল (ব্যাংকে গচ্ছিত)	মোট
৩১,৬৯,২২৮.৮৩	৪,২৩,৬৩২.৮৩	২,৮৮,৩১৯.৮৪	৩৮,৮১,১৮১.৫১

৬. সমবায় এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান (জন)

সমিতিসমূহের অফিসে চাকুরীরত	সমিতির নিজস্ব প্রকল্পে/ কর্মসূচিতে চাকুরীরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে চাকুরীরত	সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সংখ্যা	মোট
৭৭,৪৬৯	২৮,২৪২	৯৬,৭৬০	১৩,৯৩,২৭১	১৫,৯৫,৭৪২

৭. সমবায় প্রশিক্ষণ (জন)

নাম	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	১১২	২,৮৬৯
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	২৫৬	৮,৯৮১
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট	১,৪৩৫	৩৫,৭৪৮
সমবায় অধিদপ্তর (ইনহাউজ প্রশিক্ষণ)	১৭	৭৭৫
মোট	১,৮২০	৪৮,৩৭৩

৮. সমবায় সমিতি নিবন্ধন

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
৪	৪,৩১৮	৪,৩২২

৯. সমিতির নিবন্ধন বাতিল

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
০	১১৯৪৬৩	১১,৪৬৩

১০. সমবায় সমিতি অডিট (কার্যকর সমিতি) (জন)

সমবায় সমিতির শ্রেণি	অডিটযোগ্য সমবায় সমিতির সংখ্যা	অডিটকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা
জাতীয় সমবায় সমিতি	১১	১১
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	১,১৪৯	১,১৪৫
প্রাথমিক সমবায় সমিতি	১,৩১,০৬০	৭৬,৩১৬
মোট	১,৩২,২২০	৭৭,৪৭২

১১. অডিট ফি, নিবন্ধন ফি, সিডিএফ আদায় (লক্ষ টাকা)

অডিট ফি আদায়	৪৩২.৮২
নিবন্ধন ফি আদায়	৫.৯৯
সিডিএফ আদায়	৭৮০.০৫

সূত্র: এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর

সাম্য ও সমতায়,
— দেশ গড়বে সমবায়

মুনিমা হাফিজ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের মূলে নিহিত ছিল সাম্য, ন্যায় এবং মর্যাদার এক অনিবার্য মানবিক আকাঙ্ক্ষা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র ভূখণ্ড পুনর্দখলের সংগ্রাম ছিল না। এটি ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির এক ঐতিহাসিক অভিযাত্রা। তবে ঔপনিবেশিক কাঠামোতে গড়ে ওঠা এ রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমাজে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা কিংবা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সমাজে বৈষম্য তৈরির মাধ্যমে একদলকে 'অবিশ্বাস্য ধনী' তৈরি করা ছাড়া চলতি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর কোনো বড় অর্জন নেই। উন্নয়নের যাত্রায় সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এখনো এক অব্যাহত চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্ট এ আকাশচুম্বী বৈষম্য নিরোধে এবারের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়" খুবই প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে মডেল হিসেবে বার্ড প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খানের মতে সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়, যা বৈষম্য কমাতে ও সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রবৃদ্ধির আড়ালে বৈষম্য

জিডিপি, জিএনআই প্রবৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচক দুই দশক ধরে জানান দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি অনুন্নয়ন ও পরনির্ভরতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি একটি গড় সূচক মাত্র। মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্যও বাড়তে থাকা মোটেই ইতিবাচক নয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান বৈষম্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই আয় বৈষম্য। ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে বাংলাদেশের জনগণের আয়বৈষম্য পরিমাপক জিনি সহগের মান নির্ধারিত হয়েছে ০.৪৯৯। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর সেই জিনি সহগের মান ছিল ০.৩১। এই হিসাব বলছে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে বাংলাদেশ একটি 'উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশে' পরিণত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওয়েলথ এক্সের ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৮তে একটি তথ্য পাওয়া যায়। ২০১২ থেকে ২০১৭ এই ৫ বছরে অতিধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সারা বিশ্বে ১ নম্বর স্থান দখল করেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে বেশি ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩০ দশমিক ০৪ শতাংশ পুঞ্জীভূত । অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র ০.৩৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষে দেশের ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার ওপর আমানত আছে এমন হিসাবধারীর সংখ্যা ১ লাখ ১৯ হাজার। ২০০০ সালে এ সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজারের কম। এই হিসাবে মাত্র ১ লাখ ১৯ হাজার ব্যক্তি আমানতকারীর হাতে রয়েছে দেশের মোট ব্যাংক আমানতের ৪২ শতাংশ।

বাংলাদেশে আয় ও সুযোগের বণ্টনে গভীর আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজ করছে। শহর ও গ্রামের ব্যবধান যেমন প্রকট, তেমনি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও আয়ের ফারাক ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। নগরাঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়লেও গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজ সেই সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত। জমির মালিকানায় অসমতা এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের ভারসাম্যহীনতা উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে দিয়েছে, ফলে দারিদ্র্যের ঘনত্ব সেখানেই বেশি। এই বৈষম্য না প্রাকৃতিক, না অনিবার্য। এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সৃষ্ট এক অভিঘাত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বৈষম্যের চিত্র অনুরূপ। জিডিপির ৩%—এরও কম অর্থ এই খাতে বরাদ্দ থাকায় মানসম্মত সেবা কেবল সচ্ছল শ্রেণির নাগালের মধ্যে সীমিত। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যে স্বাস্থ্যব্যয় বেড়ে গেছে; প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ চিকিৎসা ব্যয় নিজ পকেট থেকে মেটায়, যার ফলে প্রতিবছর লক্ষাধিক পরিবার নতুন করে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারগুলোকে গড়ে ৭০% ব্যয় বহন করতে হয়, যেখানে বেসরকারি শিক্ষার খরচ সরকারি ব্যবস্থার তুলনায় বহুগুণ বেশি। এই পরিস্থিতি দেশে সামাজিক গতিশীলতাকে সীমিত করছে এবং সমতার পথে এক স্থায়ী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈষম্যরোধে মানবিক মন্ত্র

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমাতে বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম শিল্প বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত অসংখ্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও সমবায় আন্দোলন বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। সমবায় আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা, সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সম্পদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অসাম্য দূর করা। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্য সমান অধিকার ও সুবিধা পেয়ে থাকেন, যা বৈষম্য কমাতে একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই মডেলটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছে। স্পেনের মন্ড্রাগন কর্পোরেশন, ভারতের আমূল এবং কানাডা ও ইউরোপের নানা কৃষি সমবায় যা সদস্যদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করেছে (ICA, 2020)। বাংলাদেশে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে মিল্কভিটা দুগ্ধ সেক্টরে ন্যায্যমূল্য ও গুণগতমানের নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমবায়কে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে (UN, 2014)। জাতীয় সমবায়

নীতি, ২০১২ এ সমবায়কে একটি 'মানবিক প্রযুক্তি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে মডেল হিসেবে বার্ড (বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট) প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খানের গবেষণা এবং উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাঁর 'কুমিল্লা মডেল' নামে খ্যাত এই উন্নয়ন কাঠামো মূলত সমবায় এবং আত্মনির্ভরশীলতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর মতে সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়, যা বৈষম্য কমাতে ও সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পুঁজির দুর্বৃত্তায়ন ও সমবায় আন্দোলন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালিসমূহের মালিক জনগণ। রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা এই তিন ধরেনর মালিকানা ব্যবস্থা সংবিধানে স্বীকৃত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব মেহনতি মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা।

তবে বিগত পাঁচ দশকে পুঁজিবাদী যে ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, বিকাশ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে তা সংবিধানের সমাজতন্ত্র ও সমবায় মালিকানার আদর্শের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের এই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে এক নতুন ধনিক শ্রেণির সৃষ্টি করেছে, যা সমাজের বৃহত্তর অংশের জন্য ক্ষতিকর এবং সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যার উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সমবায় আন্দোলন তথা সাম্যের অর্থনীতি দারুণভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। কমেছে সমবায়ের ঋণ প্রবাহ, উৎপাদন ও বণ্টনে উৎপাদনকারীর অংশগ্রহণ, বেড়েছে বেসরকারি ঋণ প্রবাহ ও সুদের দাপট।

এ বাস্তবতায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরটি প্রধান কার্যালয়সহ ৮টি বিভাগীয়, ৬৪টি জেলা ও উপজেলা/মেট্রো কার্যালয় এবং ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত যার মাধ্যমে বিদ্যমান ১.৭৪ লক্ষ সমবায় ও ১.২ কোটি সমবায়ীকে সেবা প্রদান দুরূহ হয়ে পড়ছে।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে : সমবায় নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান, নিরীক্ষা ও তদারকির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ, কর্মকর্তা ও সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন, মূলধন সঞ্চয় ও স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সমবায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, মূল্যবোধ প্রচার, বাজার সংযোগ ও সমবায় পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে অধিদপ্তর গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (SDG) অর্জনে সমবায় কাঠামো বিশেষভাবে কার্যকর। এর ১৭টি লক্ষ্যের প্রায় সবগুলোতেই সমবায়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

সেবার মানোন্নয়নে Integrated Digital Service Delivery Platform (IDSDP) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে

জুলাই অভ্যুত্থানে সমতা ও ন্যায্যতার স্লোগান দিয়ে অকাতরে রক্ত দিয়েছে হাজারো ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। তাদের দাবী, ভাষা, আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের জানা, বোঝা জরুরি। যদি আমরা তা বুঝতে পারি তবে দেশে সমতাভিত্তিক অর্থনীতির দিকে জোর দিতে হবে।

নিবন্ধন, নিরীক্ষা ও তদারকি অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। সমবায় আইন, ২০০১ এর আধুনিকায়নের উদ্যোগও চলমান। সীমিত জনবল ও বিপুল সংখ্যক সমিতি থাকা সত্ত্বেও অধিদপ্তর তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। বর্তমানে সমবায় সমিতির মোট কার্যকরী মূলধন ৩৮,১০৭.৮২ কোটি টাকা ও সম্পদের মূল্য ৩৮,৮১১.৮২ কোটি টাকা।

সমবায় অধিদপ্তরে বর্তমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন : ১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায় সম্প্রসারণ প্রকল্প- যার মাধ্যমে ৫০টি উপজেলায় ৫,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে; ২. সমবায় মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প- যা গ্রামীণ উৎপাদন ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করবে; এবং ৩. খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান প্রকল্প- যা ২,৫০০ জনকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করবে। সমবায় সেক্টরের উন্নয়নে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের স্বল্পতা এ সেক্টরের বিকাশে অন্যতম অন্তরায়।

জুলাই অভ্যুত্থানে সমতা ও ন্যায্যতার স্লোগান দিয়ে অকাতরে রক্ত দিয়েছে হাজারো ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। তাদের দাবি, ভাষা, আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের জানা, বোঝা জরুরি। যদি আমরা তা বুঝতে পারি তবে দেশে সমতাভিত্তিক অর্থনীতির দিকে জোর দিতে হবে। যুগোপযোগী সমবায় নীতি প্রণয়ন, উন্নয়ন কৌশলে সমবায়ের আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি, নীতি সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে সমবায়কে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কার্যকর সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো হিসেবে তৈরি করতে হবে। এখনই সময় সমবায় সেক্টরকে বাংলাদেশের সমতাভিত্তিক পুনর্গঠনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পুনর্নির্মাণের।

■ মুনিমা হাফিজ : নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

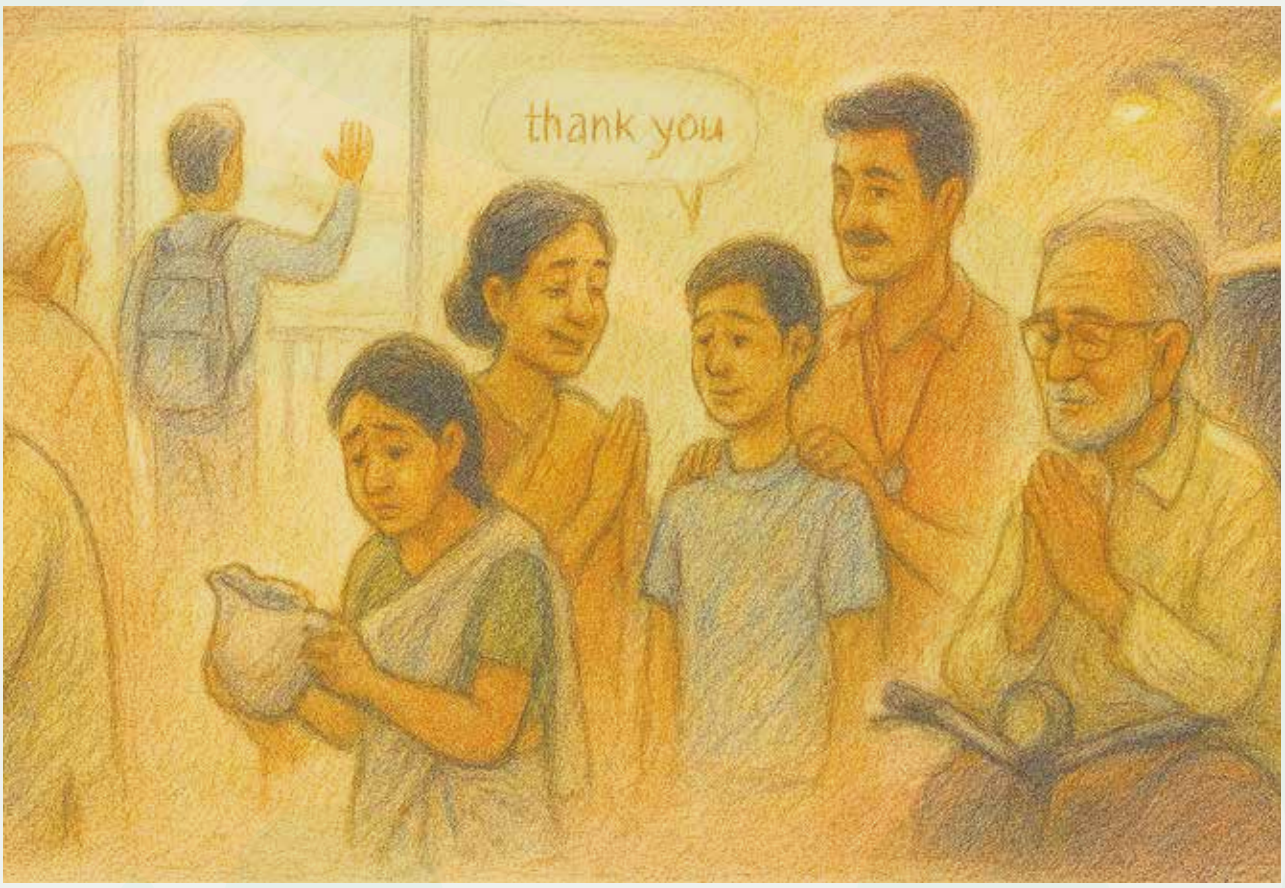

পাঁচসাধু ও সমবায়পাঠ

বাদল সৈয়দ

সমবায় কোনো দপ্তরের আলমারিতে রাখা বিধিমালা নয় বরং এক মানুষের পাশে আরেক মানুষের দাঁড়িয়ে যাওয়ার সহজ অথচ মহৎ সিদ্ধান্ত। কখনও তা প্রকাশ পায় বিপদে পড়া কারও হাত শক্ত করে ধরে রাখায়, কখনও পরিচয় না দিয়েই কারও স্বপ্নের টিকিট কেটে দেওয়ায়, কখনও বা কাউকে ‘ধন্যবাদ’ বলায়। সমবায় একটি সহযোগিতার বীজ, যা সঠিক মানুষ পেলে মহীরুহে পরিণত হয়।

এ বছরের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য“সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়”। শুনতে হয়তো একটি স্লোগান মনে হয়, কিন্তু এর আসল শক্তি লুকিয়ে আছে মানুষের ভাবনায়,মানুষের আচরণে, মানুষের কাজে। আজ আমি সাধারণ মানুষের অতিসাধারণ কয়েকটি গল্প শোনাতে চাই। তারা কোনো সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি বা প্রশিক্ষিত সমবায়কর্মী নন; অথচ তাঁদের কাজ, তাঁদের সিদ্ধান্ত, তাঁদের উদারতা বলে দেয় মানুষ ও সমাজ গঠনের মূলমন্ত্র। আসুন গল্প শুনি:

১.

আমার ছোটো ফুপা কাতারে থাকতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। স্যুটকেসে ভর্তি উপহার নিয়ে। একবার

তিনি দেশে এসেছেন। আমি তাঁর সাথে লেপ্টে আছি। কারণ তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে হারুনের সাথে আমার কোনো পার্থক্য করতেন না। দুজনের জন্য একই খেলনা, একই পোশাক, একই চকলেট। দেশে থাকলে তিনি আমাদের দুজনকে স্কুলে নিয়ে যেতেন, কুলফি আইসক্রিম কিনে দিতেন, তার উপর দুজনের জন্য আট আনা করে বরাদ্দ। একদিন বিকালে তার বাসায় বসে আছি। তিনি বিশাল নাস্তার বহর কিনে এনেছেন, আমি আর হারুন খপাখপ খাচ্ছি। ফুপাতো বোন সাবিনা, সুরাইয়া, সুমি ছোটো, তাই আমাদের খাদ্য হামলার মুখে বেশি সুবিধা করতে পারছে না। ফুপার কোলে বসা সবার ছোটো দিশা। বিদেশি জামায় তাকে পুতুলের মতো লাগছে। এমন সময় দরজায় টকাটক শব্দ হতে লাগল। কেউ এসেছেন। ফুপু উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। তা আধা ফাঁক করে কার সাথে যেন কথা বললেন, তারপর ফুপার কাছে এসে বললেন, বাজারের মুদি দোকানি জয়নাল সাহেব, কী একটা ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আসতে বলব?

ফুপা বললেন, অবশ্যই, আসতে বলো, কিন্তু কী ব্যাপারে বলবেন?

জানি না, আপনাকেই বলতে চান।

আচ্ছা, আসতে বলো।

একটু পর উদভ্রান্তের মতো জয়নাল সাহেব ছুটে এলেন। তার চোখ লাল, তাতে রাত জাগার চিহ্ন, চুল উস্কোখুস্কো, জামা ময়লা হয়ে আছে। ফুপা উঠে গিয়ে তাকে হাত ধরে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইসাহেব, কোনো সমস্যা হয়েছে? আপনাকে এরকম লাগছে কেন?

জয়নাল সাহেব ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, ভাই, আমার স্ত্রীর দুটো স্বর্ণের বালা এনেছি। কিনবেন? আমার খুব বিপদ।

ফুপা অবাক হয়ে বললেন, ভাবির বালা বিক্রি করবেন! কেন?

আমার ছেলেটা খুব অসুস্থ, অপারেশন লাগবে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। দয়া করে বালাগুলো কিনে নেন, ওগুলো বিক্রি করা ছাড়া উপায় নাই। মোট তিন ভরি স্বর্ণ, বাজারে এখন সোনার দাম ভরি প্রায় তিন হাজার টাকা, সে হিসাবে দাম আসে নয় হাজার টাকা। আমার পাঁচ হাজার টাকা হলেই চলবে। বলতে বলতে তিনি বালাগুলো প্যান্টের পকেট থেকে বের করে আনলেন। শেষ বিকেলের মরা আলোয় তা ঝকঝক করতে থাকে। ফুপা সেগুলো হাতে নিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না, মনে হচ্ছে এগুলো আপনার শেষ সম্বল, বিক্রি না করলে কি হয় না?

না, হয় না, ভাই। ছেলেটার অপারেশনে পাঁচ হাজার টাকা লাগবে, আমার কাছে ওতো টাকা নাই।

যদি আমি টাকাটা ধার দেই, চলবে?

না, ভাই, আমি ধার নিবো না, কারণ তা শোধ করার ক্ষমতা আমার নাই। আপনি বরং পাঁচ হাজার টাকায় এটা কিনে নিলে খুব উপকার হয়।

ফুপা আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরের রুমে গেলেন। একটু পর বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকের হাতে একশ টাকার একটি বান্ডেল দিতে দিতে বললেন, নিন, এখানে নয় হাজার টাকাই আছে, বাজারে তো তিন ভরি স্বর্ণের দাম নয় হাজার টাকা বললেন, তাই না?

দোকানি ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু আমি তো পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছি!

ফুপা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, ভাইসাহেব, আপনি বিপদে পড়ে নয় হাজার টাকার জিনিস পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করতে চাইছেন। এ বিপদের সুযোগ নিয়ে আপনাকে ঠকালে খোদাতায়ালা আমাকে ক্ষমা করবেন না।

আমার বড় আদরের ছোটো ফুপা খোদার কাছে ফিরে গেছেন অনেক আগে, কিন্তু তার কথাগুলো আমার কানে প্রতিনিয়ত বাজে। আমি আরেকটু 'মানুষ' হয়ে উঠার চেষ্টা করি।

তারা কোনো সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি বা প্রশিক্ষিত সমবায়কর্মী নন; অথচ তাঁদের কাজ, তাঁদের সিদ্ধান্ত, তাঁদের উদারতা বলে দেয় মানুষ ও সমাজ গঠনের মূলমন্ত্র।

২.

ইব্রাহিম সাহেব দুবাই এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন। ঘণ্টা দুয়েক পর তাঁর টরেন্টোর কানেকটিং ফ্লাইট। এমন সময় পাশে বসা ছেলেটির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। ছোটোখাটো, শ্যামলা বর্ণ, কাঁধে একটি ব্যাকপ্যাক। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ, মেধায় জ্বলজ্বল করছে। ছেলেটিকে দেখে তাঁর কী যেন মনে হচ্ছে। তিনি আর সামলাতে পারলেন না, আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর ইউ ফ্রম বাংলাদেশ?

ইয়েস।

গ্রেট- আমিও বাংলাদেশি। তোমার নাম কী, বাবা?

শাকিল আহমেদ।

তুমি কোথায় থাকো?

আমি ইউনিভার্সিটি অব চিকাগোতে ডেটা সায়েন্সে মাস্টার্স করছি।

চমৎকার! কনগ্র্যাচুলেশন। তা বাংলাদেশে তোমার বাড়ি কোথায়?

কুমিল্লা। আপনি কোথায় থাকেন, আংকেল?

টরেন্টোতে। আমিও তোমার মতো ইঞ্জিনিয়ার, হা-হা-হা-হা। চলো, কফি খেতে যাই।

ছেলেটি ইতস্তত করছে।

ইব্রাহিম সাহেব তার হাত ধরে বললেন, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এখানে তোমার বাবা থাকলে কি তিনি তোমাকে খাওয়াতেন না?

দুজনে উঠে গিয়ে কফি শপে বসলেন। কিছুক্ষণ পর ইব্রাহিম সাহেবের প্লেনের ডাক পড়ল।তিনি ছেলেটির ঝাঁকড়া চুলে হাত রেখে বিদায় নিলেন। তারপর হাঁটা শুরু

মানুষ থাকবে মানুষের পাশে। যদি এভাবেই মানুষ মানুষকে জড়িয়ে ধরে, তবে একদিন বাংলাদেশ সত্যিই হয়ে উঠবে বিশাল এক সমবায় পরিবার। সাম্য ও সমতায় গড়া সেই দেশ তখন স্লোগানে নয়, বাস্তবেই জেগে উঠবে।

করলেন।

ইব্রাহিম সাহেব ছেলেটিকে চেনেন। খুব ভালোভাবে চেনেন। কারণ কয়েক বছর আগে তার জীবনবৃত্তান্ত তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে তখন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেয়েছে, কিন্তু প্লেন ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক কিছু খরচের জন্য আটকে গিয়েছিল। তখন বাংলাদেশের `পে ইট ফরোয়ার্ড' নামে একটি সংগঠন মেধাবী ছাত্রটিকে কেউ সাহায্য করতে পারেন কি না জানতে চাইলে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী পুরো খরচ দিয়েছিলেন।

ভাবতে ভাবতে তিনি পেছন ফিরে তাকালেন, 'উজ্জ্বল'' ছেলেটি হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে, ইব্রাহিম সাহেব হাত নেড়ে তার জবাব দিলেন। একবার ভাবলেন, ফিরে গিয়ে ছেলেটিকে পরিচয় দেবেন, পরক্ষণেই মাথা নেড়ে নিজে নিজেই তা ডিসমিস করে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে মিলিয়ে গেলেন।

সবসময় সব কথা বলতে নেই।

৩.

কয়েক বছর আগের কথা।

এক বাসায় নাস্তার টেবিলে বসেছি।

অন্যান্য সুন্দর প্লেটে নাস্তা দেওয়া হয়েছে। পানির গ্লাসগুলোতে অদ্ভুত সুন্দর কারুকাজ। চায়ের কাপেও তাই। সবচেয়ে চমৎকার যে কেতলিতে চা আনা হয়েছে তা। সাদা পটভূমিতে লাল গাউন পরা একটি মেয়ে মাথা নিচু করে কী যেন দেখছে। মনে হচ্ছে মেয়েটির মন খুব খারাপ। সে মাথা নিচু করে চোখ লুকাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, এত্তো সুন্দর ক্রোকারি কোথায় পেয়েছেন ভাবি?

তিনি মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, জাপান থেকে এনেছিলাম। আমার খুব প্রিয়।

নাস্তা শেষে গৃহকর্মীরা সব উঠিয়ে নিচ্ছেন, এমন সময় একজনের হাত পিছলে অপূর্ব কেতলিটি মেঝেতে পড়ে খানখান হয়ে গেলো।

যার হাত থেকে পড়েছে তাঁর চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ভাবি দেখি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন।

আমিও ফ্যালফ্যাল করে কয়েক টুকরো হওয়া কেতলিতে আঁকা গাউন পরা মেয়েটিকে দেখছি।

তারপরের মুহূর্তে দেখলাম ভাবি সামলে নিয়ে গৃহকর্মীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সমস্যা নেই। একটু পরিষ্কার করে ফেলো। থ্যাংক ইউ।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। মেয়েটি ভেতরে গেছে ঝাড়ু আনতে। বিস্মিত ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ভাবি ওকে কিছু না বলে ধন্যবাদ দিলেন যে!

তিনি উত্তর দিলেন, অসহায় একটি মেয়ে, আরেকজনের বাসায় কাজ করছে। কী ভয়টা পেলো দেখলেন না! সামান্য 'থ্যাংক ইউ' বলে যদি তার ভয়টা কাটানো যায় সমস্যা তো নাই।

আমি ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে ভাবছি, এমন করুণা সিন্ধুর খোঁজ তিনি কোথায় পেলেন?

৪.

অদ্ভুত মানুষটি ছোটোবেলায় আমার খেলার কুদরত দেখে বললেন, না, তোকে দিয়ে খেলা হবে না।

আমি হতাশ কণ্ঠে বললাম, তাহলে কী হবে?

তোকে দিয়ে অন্য জিনিস হবে, খেলা না।

আমার খুব অভিমান হলো। কিশোরদের অভিমান সর্বগ্রাসী। আমি চোখের জল আটকে বললাম, কোনো জিনিস হবে?

তোকে দিয়ে পড়ালেখা হবে। ওইটাই তোর ভবিষ্যৎ। কাল থেকে তুই পর্যাকটিসে আসবি না।

আসব না!

না, কঠিন কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন।

তীব্র অভিমান নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

এই অদ্ভুত মানুষটি থাকতেন আমাদের কলোনিতে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ সিজিএস কলোনি। তিনি কাজ করতেন খেলাধুলা নিয়ে। সারা বছর তার উদ্যোগে পাড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্ট লেগেই থাকতো। কারো মধ্যে ভালো খেলোয়াড়ের চিহ্ন দেখলেই হলো, তার জান শেষ! তিনি তাকে নিয়ে লেগে থাকতেন। তার হাত ধরে আমাদের কলোনির অনেকেই জাতীয় ফুটবল দলে খেলেছেন। অথচ সে অর্থে তিনি ধনী ছিলেন না, সরকারি চাকরি করতেন। বাড়ির বাজার না করেই অনেক সময় খেলোয়াড়দের প্রয়োজন মেটাতেন।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমিও তার হাতেই সেরা খেলোয়াড় হবো, কিন্তু তিনি এক কথায় আমাকে ডিসমিস করে দিলেন। তীব্র অভিমানে আমি এরপর তার কাছে আর কখনোই যাইনি। তখন বয়সটাই ছিল অভিমানের বয়স। তবে মাঝে মাঝে রাস্তাঘাটে দেখা হলেই বলতেন, পড়াশোনা ঠিকভাবে করছিস তো? আমি জবাব না দিয়ে হনহন করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।

অনেক বছর পর আমি বিসিএস পাস করলাম। রেজাল্ট হওয়ার কদিন পর তিনি বাসায় হাজির। কোনো ভূমিকা ছাড়া বললেন, রেডি হয়ে নে, কাজ আছে।

আমি কিছুটা রাগ নিয়ে বললাম, কী কাজ?

তিনি কড়া ধমক দিয়ে বললেন, সেটা গেলে দেখবি, আসতে বললাম, আয়।

চরম বিরক্তি নিয়ে বের হলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন বিখ্যাত দর্জির দোকান 'ফেরদৌসে'। আমি বুঝতে পারছি না, এখানে আমার কাজ কী?

তিনি কাউন্টারে গিয়ে বললেন, স্যুটের কাপড় দেখান তো। বেস্ট স্যুটের কাপড়।

আমি শুধু অবাক না, বিরক্তও। উনি স্যুট বানাবেন, আমাকে কেন নিয়ে এলেন?

ওমা! কাপড় হাতে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, ওর মাপ নিন।

আমি তো অবাক! এ স্যুট আমার জন্য!

স্যুটের মাপ দিয়ে বাড়ি ফিরছি। জীবনের প্রথম স্যুট। এখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না।তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন, তারপর বললেন, আমি জানি, আমার ওপর তোর অনেক অভিমান, কিন্তু সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না, তোকে দিয়ে খেলাধুলা হতো না। তাই আমি তোকে প্র্যাকটিস থেকে বের করে দিয়েছিলাম। আরে! দেশে শুধু ভালো খেলোয়াড় হলে চলবে? দেশ চালানোর জন্য লোক লাগবে না? আজ খুব আনন্দের দিন, কারণ আমার কথা সত্য হয়েছে। তোকে দিয়ে পড়ালেখাটা হয়েছে, ভালোভাবেই হয়েছে।

আমার খুব কান্না পাচ্ছে, লুকিয়ে ফেলছি, তরুণ বয়সে সবার সামনে কাঁদা যায় নাকি?

অদ্ভুত মানুষটির নাম মোজাম্মেল ভাই। আমাদের মোজাম্মেল ভাই।

৫.

ডাক্তার রবীন্দ্র বণিক।

চট্টগ্রামের অন্যতম প্রবীণ একজন চিকিৎসক ছিলেন।

আপাদমস্তক সিনেমায় দেখা ডাক্তার। গৌড় বর্ণ, পরিষ্কার সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, হাতে ডাক্তারি ব্যাগ।

জীবনযাত্রা অতি সাদামাটা।

এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করে ডাকা হতো ‘বাজপাখি’।

কারণ একই ক্ষিপ্রতায় তিনি মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে এনে স্বজনদের বুকে ফিরিয়ে দিতেন।

যত রাত হোক 'কল' এলেই রিকশায় চেপে তিনি হাজির হতেন রোগীর বাড়িতে।

আমরা তাঁকে ডাকতাম 'ডাক্তার কাকা।'

তো, একবার প্রায় মধ্যরাতে বাবার শরীর খুব খারাপ হলো।

আমি ছুটলাম ডাক্তার কাকার কাছে। তিনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার হাঁকডাকে উঠে এলেন, তারপর ধীর গলায় বললেন, "বয়, আসছি।"

তাঁর চেহারায় ঘুমের ক্লান্তি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এলেন।

গাড়িতে ওঠার পর দেখি চোখ বুজে আছেন।

মনে করলাম, ক্লান্ত, তাই ঘুমাচ্ছেন।

কিন্তু মৃদু গুনগুনানি শুনে বুঝলাম ঘুমাচ্ছেন না, বিড়বিড় গুনগুন করছেন।

বাসায় পৌঁছার পর বাবাকে দেখলেন। কিছু ওষুধ দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, হাসপাতালে নিতে হবে?

তিনি মাথা নাড়লেন, না, নিতে হবে না।

সাথে সাথে তা মেনে নিলাম। কারণ বণিক কাকার সিদ্ধান্ত কখনো ভুল হয় না।

ফিরে আসার সময় দেখি তিনি আবার চোখ বুজে গুনগুন করছেন।

তাঁর বাড়ি যখন পৌঁছালাম তখন প্রায় রাত একটা।

আমি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি, হঠাৎ কী মনে করে জিজ্ঞেস করলাম, “কাকা, গাড়িতে গুনগুন করে কী গাইছিলেন?”

স্ট্রিটলাইটের আলোতে তাঁর হাসিটা কেমন যেন অপার্থিব মনে হলো। তিনি বললেন, ভগবানের কাছে দয়া ভিক্ষা করি বেটা, আমার হাতে তিনি যেন সেই ক্ষমতা দেন, যাতে রোগী বাঁচাতে পারি। তারপর গুনগুন করতে লাগলেন,

"যদি লাগে আমারি আয়ু নাও, হোক নিজের ক্ষয়,

রোগীরে প্রাণ ভিক্ষা দাও প্রভু, সে থাকুক অব্যয়।"

তাঁর কণ্ঠে এখন আর্দ্রতা তা পরম মমতার ছোঁয়া নিয়ে মিশে যাচ্ছে কুয়াশায়।

আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি চিকিৎসক এই প্রার্থনাই করেন। তিনি চান না, তাঁর হাতে কোনো রোগী মারা যান। সবাই নিজের মতো বিড়বিড় করেন, "যদি লাগে আমারি আয়ু নাও, হোক নিজের ক্ষয়---- রোগীরে প্রাণ ভিক্ষা দাও প্রভু, সে থাকুক অব্যয়।"

***

গল্পের পাঁচজন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সমবায়ের বক্তৃতা দেননি, কোনো নিউজ চ্যানেলে তাঁদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়নি, এমনকি তাঁদের অধিকাংশের নামও আমরা ভুলে যাব একদিন। কিন্তু তাঁদের কাজ সভা-সেমিনারের বক্তব্যের চেয়েও শক্তিশালী। কারণ তাঁরা শিখিয়েছেন : সহযোগিতা মানে দয়া নয়, বরং সম্মান; সাহায্য মানে দান নয়, বরং সম্পর্ক; আর সমবায় মানে কাগুজে সদস্য তা নয়, বরং হৃদয়ের দায়বদ্ধতা। কেউ কাঁদতে থাকা বাবার হাতে তিন ভরির দামে পুরো টাকা তুলে দিয়েছেন, কেউ নিজের পরিচয় গোপন রেখে অচেনা এক ছাত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়েছেন, কেউ ভাঙা কেতলি নিয়ে রাগ না করে ধন্যবাদ বলেছেন, কেউ রাগী কিশোরকে ফুটবল মাঠ থেকে সরিয়ে একদিন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বানানোয় বিশ্বাস রেখেছেন, আর কেউ রাত জেগে রিকশায় গিয়ে অন্যের জীবন বাঁচানোর আগে নিজের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন: “আমার আয়ু কমুক, রোগীর জীবন বাড়ুক।” যদি এটিই সমবায়ের সত্যিকারের অর্থ হয়, তবে আমাদের আলাদা কোনো স্লোগানের দরকার নেই। দরকার শুধু এতটুকু সাহস। মানুষ থাকবে মানুষের পাশে। যদি এভাবেই মানুষ মানুষকে জড়িয়ে ধরে, তবে একদিন বাংলাদেশ সত্যিই হয়ে উঠবে বিশাল এক সমবায় পরিবার। সাম্য ও সমতায় গড়া সেই দেশ তখন স্লোগানে নয়, বাস্তবেই জেগে উঠবে।

আসুন মায়া ছড়াই।

■ সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ : প্রেসিডেন্ট (গ্রেড-১), ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনাল

আগামীর বাংলাদেশ : জেন জি ও সমবায়ের নতুন স্বপ্ন

সোহেল নওরোজ

বাংলাদেশ এমন এক সময়ে এসে পৌঁছেছে, যখন উন্নয়ন কেবল পরিসংখ্যান নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, প্রযুক্তিগত রূপান্তর ও মানবিক মূল্যবোধের সম্মিলিত প্রকাশ। "সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়" প্রতিপাদ্যটি এ সময়ের জন্য একেবারে প্রাসঙ্গিক-এটি কেবল সমবায় খাতের আহ্বান নয়, বরং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন দর্শনের নৈতিক ভিত্তি। এই প্রেক্ষাপটে প্রজন্মান্তরের যে রূপান্তর ঘটছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তরুণ সমাজ-জেনারেশন জেড। ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া এই প্রজন্ম প্রযুক্তিনির্ভর, উদ্ভাবনমনস্ক, সামাজিক ন্যায়বোধসম্পন্ন ও সহযোগিতামূলক চিন্তায় বিশ্বাসী। এই বৈশিষ্ট্যই সমবায়ের দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। ফলে জেন জি প্রজন্মকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে-একটি ডিজিটাল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক অর্থনীতি হিসেবে।

জেন জি প্রজন্ম প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রজন্ম। তাদের জীবনের প্রতিটি স্তর ডিজিটাল সংযোগে গঠিত, আর তাদের মানসিক কাঠামো সহযোগিতামূলক। তারা বিশ্বাস করে, উন্নয়ন তখনই অর্থবহ, যখন তা সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমবায়ের অন্তর্নিহিত চেতনার সঙ্গে মিলে যায়-যেখানে 'আমরা' শব্দটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থের উর্ধ্বে অবস্থান করে। তরুণ সমাজের এই মনোভূমি যদি সমবায়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তবে তৈরি হতে পারে "ডিজিটাল সহযোগিতার অর্থনীতি"-যেখানে প্রতিটি সদস্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করবে, স্বচ্ছভাবে সিদ্ধান্ত নেবে, ও যৌথভাবে

সমবায়ের দর্শন নিহিত সহযোগিতা, ন্যায়বোধ ও মানবিক দায়বদ্ধতায়। জেন জি প্রজন্মও একই দর্শনে বিশ্বাসী-তারা অর্থনৈতিক লাভের সঙ্গে সামাজিক প্রভাবকেও মূল্যায়ন করে। এই দুই দর্শনের মিলনই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নতুন দিক হতে পারে।

আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এই ধারণা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যেই অনলাইন ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং ও মোবাইল ফাইন্যান্সে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে। তারা একক উদ্যোক্তা থেকে ধীরে ধীরে দলীয় বা নেটওয়ার্কভিত্তিক উদ্যোগের দিকে যাচ্ছে। সমবায় কাঠামো তাদের জন্য হতে পারে সেই প্ল্যাটফর্ম, যেখানে মূলধন, জ্ঞান ও বাজার-তিনটি উপাদান একত্র হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রিল্যান্সাররা যৌথভাবে একটি ডিজিটাল সার্ভিস কো-অপারেটিভ গঠন করতে পারে, যেখানে তারা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টের সঙ্গে দরকষাকষি, পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা ও বীমা সুবিধা যৌথভাবে পাবে। একইভাবে নারী উদ্যোক্তারা অনলাইন মার্কেটিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উইমেন-লেড কো-অপ মডেল তৈরি করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী সমবায় অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য দিকনির্দেশনা। স্পেনের বাস্ক অঞ্চলের Mondragon Corporation, বিশ্বের বৃহত্তম শ্রমিক-স্বত্বভিত্তিক সমবায়, প্রমাণ করেছে কীভাবে সদস্য নেতৃত্ব ও উদ্ভাবনের সমন্বয়ে বিশ্বমানের শিল্প গড়ে তোলা যায়। ১৯৫৬ সালে কয়েকজন কারিগর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন বর্তমানে শতাধিক কোম্পানির নেটওয়ার্ক, যেখানে মালিকানা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ উভয়ই শ্রমিকদের হাতে। অস্ট্রেলিয়ার Cooperative Bulk Handling (CBH) Group একইভাবে কৃষিভিত্তিক সমবায়ের সাফল্যের মডেল-১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান আজ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হাজারো কৃষকের মালিকানাধীন, যারা বছরে লক্ষ লক্ষ টন শস্য রপ্তানি করে। জার্মানির Býrgerwind energy cooperatives স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যেখানে বিনিয়োগ, মুনাফা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ স্থানীয় মানুষের হাতে। আফ্রিকার কেনিয়া ও রুয়ান্ডায় তরুণ কৃষকরা মোবাইলভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বাজারে বিক্রি করছে, ফলে মধ্যস্বত্বভোগী হ্রাস পাচ্ছে এবং আয় বাড়ছে। এই উদাহরণগুলো দেখায়, সমবায় কেবল কৃষি বা উৎপাদনের নয়, এটি একটি সাংগঠনিক দর্শন-যেখানে প্রযুক্তি, ন্যায্যতা ও আস্থা একই বৃত্তে অবস্থান করে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই মডেলগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব। স্থানীয় কৃষক, তরুণ উদ্যোক্তা, নারী নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ-সবাই যদি অংশ নেয়, তবে তৈরি হতে পারে এমন সমবায়, যা একইসঙ্গে উৎপাদনশীল ও মানবিক। নবায়নযোগ্য শক্তি, কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, শিক্ষা, এমনকি তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও সমবায় কাঠামো সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, "স্মার্ট কো-অপারেটিভ" ধারণার অধীনে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শেয়ার ব্যবস্থাপনা, ব্লকচেইন হিসাবরক্ষণ এবং অনলাইন ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে সমবায় হবে আরও স্বচ্ছ, তরুণবান্ধব ও কার্যকর।

তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। অতীতের দুর্নীতি ও অদক্ষতা অনেকের আস্থা নষ্ট করেছে, এবং তরুণরা অনেক সময় সমবায়কে পুরনো প্রতিষ্ঠানের প্রতীক মনে করে। শহর ও গ্রামের ডিজিটাল বিভাজনও সমান সুযোগের পথে বাধা। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে সমবায়কে পুনঃব্র্যান্ডিং করতে হবে-এমন এক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে হবে, যা আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং মূল্যবোধসম্পন্ন। এর জন্য প্রয়োজন আইনি কাঠামোর সংস্কার, ডিজিটাল রূপান্তর, ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি। যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে 'সহযোগিতার অর্থনীতি' বিষয়টি পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়, তাহলে তরুণ প্রজন্ম সমবায়ের নৈতিক ও বাস্তব উভয় দিক সম্পর্কে সচেতন হবে।

সমবায়ের দর্শন নিহিত সহযোগিতা, ন্যায়বোধ ও মানবিক দায়বদ্ধতায়। জেন জি প্রজন্মও একই দর্শনে বিশ্বাসী-তারা অর্থনৈতিক লাভের সঙ্গে সামাজিক প্রভাবকেও মূল্যায়ন করে। এই দুই দর্শনের মিলনই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নতুন দিক হতে পারে। এটি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে উন্নয়ন মানে কেবল প্রবৃদ্ধি নয়, বরং অন্তর্ভুক্তি; যেখানে প্রযুক্তি কেবল হাতিয়ার নয়, বরং ন্যায্যতার ভাষা; এবং যেখানে তরুণরা কেবল কর্মী নয়, বরং সহ-নেতৃত্বের প্রতীক।

আগামীর বাংলাদেশ তাই কেবল ডিজিটাল নয়-এটি হবে সহযোগিতামূলক, মানবিক ও ন্যায়নিষ্ঠ। জেন জি প্রজন্ম যদি সমবায়ের এই আধুনিক দর্শনকে ধারণ করে, তবে সমবায় আর অতীতের প্রতীক নয়, এটি হবে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও নৈতিক চেতনার কেন্দ্র। সেই বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিক হবে অংশীদার, প্রতিটি উদ্যোগ হবে মানবিক, আর উন্নয়ন হবে সমতার আরেক নাম।

■ সোহেল নওরোজ: যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক (বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার University of Technology Sydney (UTS)-এ উচ্চশিক্ষারত)

কৃষি সমবায়ের সাফল্যগাথা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ড. জাহাঙ্গীর আলম

স্বেচ্ছায় সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত মানুষের সংগঠনই সমবায়। প্রথিতযশা বাঙালি কবি ও সমাজকর্মী কামিনী রায়ের 'পরার্থে' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'- কে সমবায়ের মূলনীতি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সমবায় হচ্ছে অংশগ্রহণকারী জনগণের স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন। এর সদস্যগণ যৌথভাবে পরিচালিত সম্পদ ও শ্রমের ভিত্তিতে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মিলিত স্বার্থে কাজ করে থাকে।

সমবায় মালিকানায় সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হয়। এটি পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতা সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। সমবায়ের সদস্যগণ নিজেরা উৎপাদন করে, ভোগ করে ও বিপণনে অংশগ্রহণ করে। সমবায়ের মাধ্যমে ছোট উদ্যোগগুলো লাভজন হয়ে উঠে এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এর অংশীজন বেশি হলে প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। বাজারে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা যখন মানসম্পন্ন পণ্য ন্যায্যমূল্যে প্রদানে ব্যর্থ হয় তখন এর প্রতিকার হিসেবে সমবায় আবির্ভূত হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা

কৃষি মানুষের সবচেয়ে পুরনো পেশা। সমবায়েরও আদিরূপ কৃষি সমবায়। এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে কৃষক ফসলহানির সংকট কাটিয়েছে, কৃষিতে অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে, উপকরণ সহায়তা নিয়েছে, উৎপাদনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং পণ্য বিপণনে সফলতা পেয়েছে।

বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃত করা। এছাড়া সামাজিক উন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস, কর্মসৃজন ও দারিদ্র্য মোচনে সমবায় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

বাংলাদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সংগঠন গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে উপযোগমূলক সেবা, ভোগ্যপণ্য, শ্রম, পরিবহন, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা সেবা, শিল্প, গৃহায়ন, সঞ্চয় ও ঋণ প্রদান, বিমা, এবং কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কিত সমবায়। তন্মধ্যে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ক সমবায়ের পরিধি অনেক বিস্তৃত। এক্ষেত্রে অংশীজনের সাফল্য খুবই দৃশ্যমান।

কৃষি মানুষের সবচেয়ে পুরনো পেশা। সমবায়েরও আদিরূপ কৃষি সমবায়। এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে কৃষক ফসলহানির সংকট কাটিয়েছে, কৃষিতে অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে, উপকরণ সহায়তা নিয়েছে, উৎপাদনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং পণ্য বিপণনে সফলতা পেয়েছে। তাতে কৃষকদের জন্য লাভজনক হয়েছে কৃষির উৎপাদন। কৃষি সমবায়গুলোর মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ হ্রাস করা;
- ঝুঁকি উপশম করা;
- প্রতিযোগিতামূলক পণ্যবাজারে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করা;
- বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করা;
- কৃষি ব্যবসায় লাভজনক করে গড়ে তোলা; এবং
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

কৃষিকাজ বলতে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ফসল ফলানো, খাদ্যশস্য উৎপাদন, পশু-পাখি পালন, মাংস, দুগ্ধ ও ডিম উৎপাদন, মৎস্য চাষ, কৃষি বনায়ন ইত্যাদির সমষ্টিকে বুঝায়। এ বিশাল কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে সমবায়। এসবের মধ্যে শস্য উৎপাদন ও বিপণন সমবায়, দুগ্ধ সমবায়, মৎস্যচাষি সমবায়, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সমবায়, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সমবায়ের ক্ষেত্রে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক, ভারত ও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এসকল দেশে সমবায়ের বার্ষিক আয় পর্যাপ্ত। অংশীজনের সংখ্যাও অনেক বেশি। জাতীয় উৎপাদনে ও কর্ম সৃজনে দীর্ঘকাল ধরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে কৃষি সমবায়। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

জাতীয় কৃষি সমবায় ফেডারেশন জাপানের এবং সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় কৃষি সমবায় সংগঠন হিসেবে বিবেচিত। এর প্রধান দপ্তর টোকিওতে অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ থেকে এর যাত্রা। বর্তমানে এর বার্ষিক আয় ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃষি খামারগুলোর অর্থনৈতিক মান বৃদ্ধি করা, বাজার ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পাশ কাটিয়ে কৃষকদের জন্য পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষি উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করা উক্ত সমবায় সংগঠনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। জাপানের হকাইডুতে প্রতিষ্ঠিত হকুরেন কৃষি সমবায় ফেডারেশন অপর একটি উল্লেখযোগ্য সমবায় সংগঠন, যার বার্ষিক আয় ১৩.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সংগঠনটি কৃষকদেরকে উৎপাদনে ও বিপণনে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং চাষাবাদের মূলধন সরবরাহ করা এ সংগঠনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। সয়াবিন, চাল, শাকসবজি, ফলমূল, গরুর দুধ এবং দই বাজারজাতকরণে সংগঠনটি বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় কৃষি সমবায় ফেডারেশন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষি সমবায় সংগঠন হিসেবে পরিচিত। এর বার্ষিক আয় ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৬১ সালের ১৫ আগস্ট এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ হাজার ১৫৫ সমবায় সমিতি এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। এর সদস্য সংখ্যা ২.৪ মিলিয়ন। কৃষকদেরকে উৎপাদনে ও বিপণনে সহায়তা করাই এই সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য।

যুক্তরাজ্যের মিনিসোটায় প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যবসা সমবায় সংগঠন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। এর বার্ষিক আয় ৩১.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর কর্মচারীর সংখ্যা ১০ হাজার ৪৫৫ জন। কৃষকদেরকে উৎপাদনে সহায়তা করা ও নতুন প্রযুক্তি, বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ইত্যাদি যথাসময়ে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা সংগঠনটির প্রধান দায়িত্ব। পৃথিবীব্যাপী সদস্যদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করাও সংগঠনটির কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকার আর একটি উল্লেখযোগ্য সমবায় সংগঠন হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষক সমবায়। এর বার্ষিক আয় হচ্ছে

১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নত প্রযুক্তি সহায়তা, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের কাজে সংগঠনটি সদা নিয়োজিত। তাছাড়া সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে বিমা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা সংগঠনটির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের মিনিসোটায় প্রতিষ্ঠিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সংগঠন হচ্ছে ল্যান্ড ও লেকস। এর বার্ষিক আয় ১৩.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ৮ জুলাই। সংগঠনটির নিয়মিত সদস্য সংখ্যা ১,৯৫৯ জন। এছাড়া রয়েছে ৭৫০ জন অনিয়মিত সদস্য। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১০,০০০। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে পনির, মাখন, দুধ, চকোলেট, ডিম এবং পশুখাদ্য উল্লেখযোগ্য।

জার্মানির বে ওয়া পৃথিবীর আর একটি বৃহৎ কৃষি সমবায় সংগঠন। এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি। এর সদর দপ্তর মিউনিখে অবস্থিত। সংগঠনটির বার্ষিক আয় ১৮.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি কৃষি পণ্যের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। দেশে ও বিদেশে সবজি, ফল ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিপণন করা এই প্রতিষ্ঠানটির মূল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপের ফ্রিজল্যান্ড কম্পিনা একটি বিশ্ব বিখ্যাত কৃষি সমবায় সংগঠন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। মোট সদস্য সংখ্যা ১৭,৪১৩ জন। তাছাড়া এর রয়েছে ১১,৪৭৬ জন দুগ্ধ খামারি, যাদের অবস্থান জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম জুড়ে ছড়ানো। এ সংগঠনটি সদস্যদের দুগ্ধজাত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপণন করে থাকে। এর বার্ষিক আয় ১৩.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কৃষি সমবায় তথা দুগ্ধ সমবায়ের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দেশ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড। সে দেশের ফন্টেরা সমবায় সংঘ লিমিটেড বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় হিসেবে বিবেচিত। এর বার্ষিক আয় ১৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সদস্য সংখ্যা ১০,৫০০ দুগ্ধ খামারি। মোট বার্ষিক দুগ্ধ উৎপাদন ২ বিলিয়ন

লিটার। এ সংগঠনটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুধ, পনির, মাখন, দই এবং আইসক্রিম সরবরাহ করে থাকে।

ডেনমার্কে অবস্থিত আরলা ফুডস একটি বহুল পরিচিত খাদ্য সমবায়। এটি মূলত দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮০ সাল। ডেনমার্ক ও সুইডেনে ছড়িয়ে থাকা মোট ১১ হাজার ২০০ সদস্য নিয়ে এর অভিযাত্রা। মোট দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ১৩.৭ বিলিয়ন কিলোগ্রাম। বার্ষিক আয় ১৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের ১৫১টি দেশে সংগঠনটি দুধ, পনির, মাখন, ক্রিম ও মার্জারিন রফতানি করে থাকে। এ সকল পণ্য উৎপাদনের জন্য সংগঠনটিতে ৬০টি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রয়েছে। ডেনমার্কের শতকরা ৯৫ ভাগ দুগ্ধ উৎপাদন বিভিন্ন সমবায় সংগঠন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারতে বহুল পরিচিত দুগ্ধ সমবায় সংগঠন আমুল ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুজরাট সমবায় দুগ্ধ বিপণন ফেডারেশন লিমিটেড এই সংগঠনটির পরিচালনা কাজে নিয়োজিত। এতে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সদস্য সংখ্যা ৩.৬ মিলিয়ন। এর সাথে যুক্ত রয়েছে ১৩টি জেলার দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়ন, যা ১৩,০০০ গ্রামে বিস্তৃত রয়েছে। ভারতের জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড-এর তত্ত্বাবধানে আমুল শ্বেত বিপ্লব ত্বরান্বিত করে দেশটিকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশে পরিণত করেছে। এ সংগঠনটি প্রতিদিন গড়ে ৪ থেকে ৫ লক্ষ প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করছে। এর বার্ষিক আয় ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিডেট গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে এর আওতাধীন প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,৫১৭টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৭,৭৫৮ জন। এই

বাংলাদেশে এখন প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া বিপুল পরিমোণ মৎস্য, ফলমূল ও পশুপাখির খামার গড়ে তোলা হয়েছে। তাতে সমবায়ী কৃষকদের বড় অবদান রয়েছে।

সমিতির উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম মিল্ক ভিটা। তরল দুধের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি ঘি, মাখন, মিষ্টি দই, টক দই, আইসক্রিম, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং, রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। এর বার্ষিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ ৪.৩২ কোটি লিটার। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। বাংলাদেশে বর্তমানে এটি পথিকৃৎ সমবায় সংগঠন হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ সমবায়ের এক উর্বর ভূমি। বর্তমানে এ দেশে ২৯ প্রকারের সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সমিতির সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। তাতে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা প্রায় সোয়া কোটি। এদের একটি বড় অংশ কৃষি সমবায়ের সাথে জড়িত। তারা কৃষি পণ্যের উৎপাদন করছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের নাগপাশ এড়িয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করছে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রায়নের ব্যবস্থা করছে। সমবায়ী কৃষকগণ মিলিত হয়ে মাঠের ফসল সংগ্রহ করছে, মাড়াই, ঝাড়াই ও সংরক্ষণ করছে। বন্যা, খরা ও তীব্র শৈত্য প্রবাহের সময় তারা একসঙ্গে লড়ছে। একসঙ্গেই তারা মোকাবেলা করছে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈপরীত্যকে। বর্তমানে দেশের কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও গ্রামীণ জীবন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে সমবায়।

বাংলাদেশে এখন প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া বিপুল পরিমাণে মৎস্য, ফলমূল ও পশুপাখির খামার গড়ে তোলা হয়েছে। তাতে সমবায়ী কৃষকদের বড় অবদান রয়েছে। দেশের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের পক্ষে আরও অধিক দ্রুত উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়া খুবই দুষ্কর। এর জন্য দরকার তাদেরকে সংগঠিত করা। আর্থিক ও সামাজিকভাবে তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা। সমবায়ের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। এ লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করা দরকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা বাড়ানো দরকার দেশের সমবায়ী কৃষকদের জন্য। তাতে কৃষি সমবায়ের ভিত্তি আরও দৃঢ় হবে। সমৃদ্ধিশালী হবে দেশের অর্থনীতি। তবে দেশের সমবায় ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করার জন্য এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা দরকার। একে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে মুক্ত রাখা দরকার।

■ ড. জাহাঙ্গীর আলম: কৃষি অর্থনীতিবিদ। সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ (ইউজিভি); সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এবং সাবেক সদস্য-পরিচালক (কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)। গবেষণা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য একুশে পদকপ্রাপ্ত।

ই-মেইল: alamj52@gmail.com

পেশাগত প্রশিক্ষণের
ভূমিকা ও তাৎপর্য

কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন কেবল একটি অর্থনৈতিক ধারণা নয়; এটি এক সামাজিক-মানবিক দর্শন, যার লক্ষ্য মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা। এই দর্শনকে কার্যকর করার অন্যতম মাধ্যম হলো প্রশিক্ষণ। কারণ, প্রশিক্ষণ ছাড়া উন্নয়ন স্থায়ী হয় না, আর অদক্ষতা কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে না।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই, সেই নীতিকে সামনে রেখে কাজ করছে। একাডেমির নিজস্ব ক্যাম্পাসে এবং সারাদেশের দশটি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বছরের পর বছর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়-যার মধ্যে বিসিএস (সমবায়) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধুমাত্র কর্মজীবনের একটি ধাপ নয়, বরং একটি আত্মোন্নয়নযাত্রা, এক নতুন চেতনার সূচনা।

প্রশিক্ষণ: আত্ম-উন্নয়ন ও দায়িত্ববোধের বিদ্যালয়

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছিলেন, “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.” অর্থাৎ দক্ষতা কোনো এককালীন কাজ নয়, বরং অভ্যাসের ফল। পেশাগত প্রশিক্ষণ সেই অভ্যাস গড়ে তোলার জায়গা, যেখানে নিয়ম, অধ্যবসায়, ও দায়িত্ববোধ একত্রে এক নতুন মানুষ সৃষ্টি করে।

সমবায় একাডেমির পেশাগত প্রশিক্ষণেও এই দর্শন

একাডেমির প্রশিক্ষণ শুধু শৃঙ্খলা শেখায় না; এটি শেখায় সৌজন্য ও মানবিকতা। “ম্যানার্স অ্যান্ড এটিকেট” শেখার মধ্য দিয়ে কর্মকর্তারা জানতে পারেন প্রশাসন কেবল আদেশ নয়, এটি এক প্রকার মানবিক সংলাপ।

প্রতিফলিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল, পটভূমি ও শিক্ষা থেকে আগত নবীন কর্মকর্তারা এখানে এক ছাদের নিচে এসে শিখেন কীভাবে দলগতভাবে কাজ করতে হয়, কীভাবে প্রশাসনিক জটিলতা মোকাবিলা করতে হয়, এবং কীভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এই প্রশিক্ষণকে তাই কেবল প্রশাসনিক কোর্স বলা যায় না—এটি এক ধরনের মননশীল রূপান্তর প্রক্রিয়া। যেখানে একজন তরুণ কর্মকর্তা ধীরে ধীরে ‘পদের মানুষ’ থেকে ‘সেবার মানুষ’-এ পরিণত হন।

শৃঙ্খলা ও সৌজন্যের বাস্তব পাঠ

শিক্ষাজীবনে আমরা সবাই “শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা” বিষয়ে রচনা লিখেছি, কিন্তু পেশাগত প্রশিক্ষণেই তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। প্রতিদিনের সময়ানুবর্তিতা, দলগত কাজ, আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ—এসব অভ্যাসে পরিণত হয়। এই বাস্তব অনুশীলনই পরবর্তীতে কর্মজীবনে বড় সম্পদ হয়ে ওঠে। ছোট ছোট শৃঙ্খলা থেকে বড় সাফল্য আসে। একাডেমির প্রশিক্ষণে দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট রুটিনে কাজ করা, সময়মতো কাজ শেষ করা, সহকর্মীদের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি সবই নিজ সাফল্যের ভিত্তি রচনা করবে।

এ প্রশিক্ষণ শুধু শৃঙ্খলা শেখায় না; এটি শেখায় সৌজন্য ও মানবিকতা। “ম্যানার্স অ্যান্ড এটিকেট” শেখার মধ্য দিয়ে কর্মকর্তারা জানতে পারেন প্রশাসন কেবল আদেশ নয়, এটি এক প্রকার মানবিক সংলাপ।

“কঠিন প্রশিক্ষণ, সহজ যুদ্ধ”—সাফল্যের দর্শন

চীনা দার্শনিক ও সেনানায়ক সান জু (Sun Tzu) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “The Art of War”-এ লিখেছিলেন—“The more you sweat in training, the less you bleed in battle.” অর্থাৎ, যত বেশি ঘাম ঝরবে প্রশিক্ষণে, তত কম রক্ত ঝরবে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই কথাটি শুধু সামরিক অভিযানের জন্য নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সান জুর সময়কার সৈন্যরা যখন দীর্ঘ মাসব্যাপী কঠোর প্রশিক্ষণ নিত, পাহাড়ের ঢালে ভারী অস্ত্র নিয়ে অনুশীলন করত, অনাহারে রণকৌশল শিখত, তখন অনেকেই ভাবত—এত কষ্টের প্রয়োজন কী? কিন্তু যেদিন তারা বাস্তব যুদ্ধে নামত, সেদিন সেই প্রতিটি কষ্ট, প্রতিটি ঘামের ফোঁটা তাদের জীবন বাঁচাত। প্রশিক্ষণের সময় অনুশীলিত প্রতিটি কৌশল, প্রতিটি প্রতিক্রিয়া সেই যুদ্ধে রূপ নিত অভ্যাসে, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা আর দ্বিধাগ্রস্ত হতো না।

এমনই এক গল্প আছে চিন সাম্রাজ্যের সেনাপতি উ সুন-এর (Wu Sun) সম্পর্কে। তিনি যুদ্ধের আগে রাজ্যের রাজকন্যা ও দাসীদের দিয়ে কৃত্রিম সৈন্যদল তৈরি করে তাদের দিয়ে কৌশল অনুশীলন করাতেন। যখন সম্রাট তাঁকে বলেছিলেন, “নারীদের দিয়ে যুদ্ধের মহড়া কেন?”, উ সুন উত্তর দিয়েছিলেন, “যে কোনো দলকেই দক্ষ করা যায়, যদি প্রশিক্ষণ বাস্তবসম্মত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।” এই মনোভাবই প্রশিক্ষণকে শুধুমাত্র অনুশীলন নয়, বরং মানসিক প্রস্তুতির এক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সমবায় একাডেমির পেশাগত প্রশিক্ষণেও সেই দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে নবীন কর্মকর্তাদের শেখানো হয়—প্রতিটি নোটশিট, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি ফাইল, সেবাগ্রহীতার সাথে কথোপকথন কেবল প্রশাসনিক কাজ নয়; এগুলো হচ্ছে এক ধরনের “যুদ্ধ” ন্যায়, দক্ষতা ও জনসেবার। কঠোর প্রশিক্ষণের সময় যে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা তারা করেন, সেটিই পরবর্তীতে তাদের কর্মজীবনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করে।

যদি প্রশিক্ষণ কঠিন হয়, তবে কর্মজীবন সহজ হয়; কিন্তু প্রশিক্ষণ যদি সহজ হয়, কর্মজীবনের বাস্তবতা তখন নির্মম হয়ে দাঁড়ায়। প্রশিক্ষণ হলো সেই নিরাপদ ক্ষেত্র, যেখানে ভুল করা যায়—যেখানে প্রতিটি ভুলই একটি শিক্ষা। কিন্তু কর্মজীবনে ভুলের জায়গা নেই। যেমন সৈন্যরা প্রশিক্ষণে বারবার একই কৌশল অনুশীলন করে যতক্ষণ না তা তাদের প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়, তেমনি পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল নয়, প্রতিফলনশীল মানসিকতা গড়ে তোলে। এর ফলে তারা সঙ্কটেও শান্ত থাকে, এবং নীতি ও জ্ঞানের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এই কারণেই বলা হয়—“Training is not preparation for the battle; it is the battle before the battle.” প্রশিক্ষণই সেই আগাম যুদ্ধ, যেখানে জ্ঞান, মানসিক দৃঢ়তা ও দায়িত্ববোধের পরীক্ষা হয়। যিনি প্রশিক্ষণে নিজেকে জয় করেন, তিনি কর্মজীবনের যেকোনো চ্যালেঞ্জ জয় করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি: পরিবর্তনের সহযাত্রী

বর্তমান বিশ্বের প্রশিক্ষণ আর শুধুমাত্র

শ্রেণিকক্ষভিত্তিক নয়; এটি প্রযুক্তিনির্ভর, ডেটা-চালিত এবং অংশগ্রহণমূলক। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ই-ট্রেনিং, ভার্চুয়াল ক্লাস ও ডিজিটাল লার্নিং টুলস অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই পরিবর্তনের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা কেবল পাঠ্য জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকেন না; তারা তথ্যপ্রযুক্তি, ই-গভর্নেন্স, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নীতি বিশ্লেষণে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা গুরু পিটার ড্রাকার বলেছিলেন, "The best way to predict the future is to create it." সমবায় একাডেমি সেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করছে—একদল প্রযুক্তিনির্ভর, নৈতিক ও দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা তৈরির মাধ্যমে।

প্রশিক্ষণের মান ও ফলাফল: বাস্তবের মাপকাঠি

প্রশিক্ষণের প্রকৃত মান বোঝা যায় কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মাধ্যমে। যদি প্রশিক্ষণ বাস্তবসম্মত, চ্যালেঞ্জভিত্তিক ও সময়োপযোগী হয়, তবে কর্মকর্তা তার কাজের মধ্য দিয়েই তার প্রভাব প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, নিম্নমানের প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতায় ঘাটতি তৈরি করে। তাই প্রশিক্ষণের মাননিয়ন্ত্রণ, ট্রেইনারের যোগ্যতা, ও অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ—সবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানবিক সংযোগ ও দলগত সফলতা

পেশাগত প্রশিক্ষণের আরেকটি বড় অর্জন হলো মানবিক সংযোগ—ফেলো ফিলিংস। সহকর্মীদের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করা, দলগতভাবে সমস্যা সমাধান করা, এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া—এসবই নেতৃত্বের গুণাবলির ভিত্তি। বিখ্যাত দার্শনিক জন ডিউই লিখেছিলেন, "Education is not preparation for life; education is life itself." এই প্রশিক্ষণও সেই অর্থে জীবনেরই শিক্ষা—যেখানে শেখা মানে বাঁচা, আর দায়িত্ব মানে উন্নয়ন।

সমবায় আন্দোলনের বাগান: পরিচর্যার প্রতিশ্রুতি

"জঙ্গল বিনা পরিশ্রমে এমনি এমনি হয়, কিন্তু বাগান বিনা পরিশ্রমে হয় না।" সমবায় আন্দোলন হলো এক বিশাল বাগান, যার পরিচর্যার দায়িত্বে আছেন সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। তাঁদের দক্ষতা ও মনন যত উন্নত হবে, ততই এই বাগান ফুলে-ফলে ভরে উঠবে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি সেই বাগানের পরিচর্যাকারীদের গড়ে তোলে—জ্ঞান, দক্ষতা, সততা ও মানবিকতার সমন্বয়ে।

একাডেমি বিশ্বাস করে, প্রশিক্ষণই কর্মজীবনের লাইফলাইন, যা কর্মকর্তাকে কেবল পেশাদার নয়, মানুষ হিসেবেও পরিপূর্ণ করে তোলে। যারা সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে—আজ, আগামীকাল ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

■ কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহমেদ: অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত নিবন্ধক), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির বাস্তব চিত্র, ঝুঁকির কারণ বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি থেকে উত্তরণের উপায়

জেবুন নাহার

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও বহুমাত্রিক, যা ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ধারায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বস্তুত ১৯০৪ সাল থেকে এই উপমহাদেশে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রম শুরু হয়। তখন মূলত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় সমিতি সংগঠন ও পরিচালিত হতো এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারের সকল আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হতো। কিন্তু ৮০'র দশকের পর সমবায় সমিতিগুলোতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারি নীতির পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলাদেশে সংবিধানের ধারা ১৩(খ)-তে সমবায় মালিকানাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা সমবায়ের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বাধীনতার পর জাতীয় সমবায় নীতিমালা (১৯৭২, সর্বশেষ ২০১২) এবং পরবর্তীকালে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায় একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতি, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ১,২৪১টি এবং এনএসআই কর্তৃক ৪৪২টি সমিতিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ সমিতির কার্যক্রম বন্ধ, অফিস তালাবদ্ধ এবং সদস্যদের হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ পলাতক অথবা মামলার কারণে গ্রেফতার হয়েছেন।

ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় অধিদপ্তরের সর্বশেষ বার্ষিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে দেশে কৃষি, মৎস্য, দুগ্ধ, ক্ষুদ্রঋণ, আবাসনসহ ৩৫টি খাতে প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার ৯৩০টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। তন্মধ্যে ২২টি জাতীয়, ১২২১টি কেন্দ্রীয় এবং ১৭৩৬৯৮টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে যাদের ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৮ হাজার এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩৮ হাজার ১১০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় এবং প্রায় সকল আর্থিক কর্মকাণ্ডেই এসকল সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। সমিতিগুলো মূলত সদস্যদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সামাজিক বনায়ন, কুটির শিল্প, তাঁত ও হস্তশিল্পের মতো উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ সকল সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি, ব্যক্তিমালিকানা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রসারের ফলে সমবায় খাত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে থাকে। অপর দিকে সমবায় সমিতিগুলোতে নেতৃত্বের অস্বচ্ছতা, আর্থিক অব্যবস্থাপনা, সমবায় অধিদপ্তরের জনবল ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসহ নানাবিধ দুর্বলতা রয়েছে। ফলে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সমবায় সমিতিগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। বিশেষ করে সদস্যদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সেবা প্রদানের স্থায়ী ও ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সমবায়ের ব্যর্থতা। ফলে দেখা যায়, দেশে হাজার হাজার সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হলেও এক্ষেত্রে সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। পরিলক্ষিত হয় অথচ অকার্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ১,২৪১টি এবং এনএসআই কর্তৃক ৪৪২টি সমিতিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ সমিতির কার্যক্রম বন্ধ, অফিস তালাবদ্ধ এবং সদস্যদের হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ পলাতক অথবা মামলার কারণে গ্রেফতার হয়েছেন। এসকল সমিতি পরিদর্শন কালে দেখা যায়, নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি এবং প্রণীত প্রতিবেদন ছিল দায়সারা। আইন অনুযায়ী চিহ্নিত দোষত্রুটি সংশোধনের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। অডিটের সময় সঠিক খাতাপত্র প্রদর্শন না করা, আবার তদন্তকালে সমিতি কর্তৃপক্ষ অনুপস্থিত থাকায় সুষ্ঠুভাবে অডিট ও তদন্ত সম্পন্ন করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। সমবায় অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট, বিভিন্ন পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, বিভিন্ন কারণে ঝুঁকিপূর্ণ সমিতির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমবায় সমিতি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণ

সমবায় সমিতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে একটি সমিতি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিম্নলিখিত কারণগুলো বিদ্যমান থাকতে পারে।

অধিকাংশ সমবায় সমিতির আর্থিক ভিত্তি খুবই দুর্বল; একটানা কয়েক বছর ধরে অডিট রিপোর্টে লোকসান দেখানো, সমিতির কার্যকরী মূলধন খুব কম এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষতি মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত রিজার্ভ তহবিল না থাকা, আমানতের বিপরীতে নগদ জমা ও ব্যাংক ব্যালেন্স অত্যন্ত কম থাকায় সদস্যদের জমাকৃত টাকা চাহিবামাত্র বা মেয়াদান্তে ফেরত দিতে না পারা;

- শুধু ঋণ নবায়ন বা কাগজের লেনদেনের মাধ্যমে আসল আদায় না করেই সুদ বা লাভ দেখিয়ে কৃত্রিম মুনাফা তৈরি করা;
- উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে আমানত সংগ্রহ, সঞ্চয় ভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুরূপ বিভিন্ন নামে মেয়াদি ও স্থায়ী আমানত সংগ্রহ;
- আমানতকারীদের জন্য সমিতির নামীয় চেক বই ব্যবহার করা এবং ব্যাংকের ন্যায় ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করা;
- গৃহীত আমানত ও বিনিয়োগের প্রকৃত লেনদেনের তথ্য সমিতির হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ না করা এবং সমিতিতে পৃথক হিসাব বহি ব্যবহার করা ও মূলধন বিনিয়োগের খাত গোপন করা;
- সমিতির আর্থিক হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতার অভাব এবং সময়মতো অডিট না করানো বা অডিট রিপোর্টে গুরুতর ত্রুটি বা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা সংশোধন না করা;
- সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব না খুলে ব্যক্তি নামে ব্যাংক হিসাব খুলে/নগদে সমিতির লেনদেন পরিচালনা করা;
- মুনাফা ও লভ্যাংশ নিয়মিত পরিশোধ না করা বা নগদে পরিশোধ না করে সঞ্চয়ে স্থানান্তর করা;

- আবেদন যাচাই না করেই সদস্য ভর্তি করে নামে/বেনামে ঋণ প্রদান, শেয়ারের ৪০ গুণের অধিক ঋণ প্রদান করা;
- নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতীত বৃহৎ বিনিয়োগ/প্রকল্প বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ খাতে অর্থ বিনিয়োগ করা;
- সমবায় বিধি মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ না করা;
- সদস্যদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করার (খেলাপি) হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি হওয়ায় বকেয়া ও সন্দেহজনক ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের একটি অস্বাভাবিক বড় অংশ হয়ে যাওয়া;
- সমিতির অর্থায়নে ব্যক্তি নামে জমি/সম্পদ ক্রয় করা;
- অতিরিক্ত ব্যয় (ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অতিরিক্ত সম্মানী, বিলাসবহুল অফিস ভাড়া, অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় বা অতিরিক্ত বেতনভাতা ইত্যাদি) দেখিয়ে সমিতির অর্থ আত্মসাৎ, নিট লাভ হ্রাস ও মূলধনের অবক্ষয় ঘটানো;
- দুর্বল, অদক্ষ ও অসৎ ব্যবস্থাপনা এবং সদস্যদের সার্বিক কাজে সম্পৃক্তকরণে ব্যর্থতা;
- সমবায় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় অসমবায়ীদের অনুপ্রবেশ;
- গুরুত্বপূর্ণ সভা (AGM বা পর্ষদ সভা) নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না বা অনুষ্ঠিত হলেও সদস্যদের মতামতের কোনো গুরুত্ব না দেওয়া, কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত না নেওয়া;
- সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান না করা, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কর্তৃক নিজেদের স্বার্থে সমবায় আইন, বিধি ও সমিতির উপআইনের বিধান লঙ্ঘন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; এজিএম এর সিদ্ধান্ত বহির্ভূত বিনিয়োগ/সম্পদ ক্রয় করা;
- সমিতির সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত নাম ব্যবহার করা;
- কর্মএলাকার বাহিরে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং হঠাৎ করে সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করা;

- শাখা/সুপারভাইজিং অফিস, সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি নামে আইন বহির্ভূতভাবে সমিতির একাধিক কার্যালয় থাকা;
- সমিতির নামের অংশে ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট , ফাইন্যান্স বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা;
- সমবায় আদর্শ অনুসরণ না করে শুধু ঋণ দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সদস্য ভর্তি করা এবং ইচ্ছামতো সদস্যপদ বাতিল করা;
- বিধি বহির্ভূতভাবে পরিবার ও স্বজনকেন্দ্রিক কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের মোটা অঙ্কের পারিতোষিক প্রদান করা;
- সমবায় অধিদপ্তরের পরিপত্র, আদেশ বা পূর্ববর্তী তদন্তের নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করা এবং নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তদন্ত কাজে অসহযোগিতা করা; সম্পাদিত অডিটের উপর সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিল না করা;
- সমবায় আইন ও বিধিমালার অপপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে সমিতির শেয়ার মূলধন ইচ্ছাকৃতভাবে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বা তার নিম্নে রাখা।

কোনো সমবায় সমিতিতে উপরোল্লিখিত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে বুঝতে হবে, সমিতিটি মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে এবং এর বিলুপ্তি বা অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

ঝুঁকিপূর্ণ সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সীমাবদ্ধতা

সমবায় সমিতিগুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা অকার্যকর হওয়ার জন্য কোনো পক্ষকে এককভাবে দায়ী করা যাবে না বরং সমবায় কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই যৌথভাবে দায়ী। বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে রয়েছে সরকার/নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠান/সমবায় অধিদপ্তর এবং সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি/সমবায়ী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সীমাবদ্ধতা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

ক. সরকার/নীতি নির্ধারক

- সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এবং সমবায় সমিতি পরিচালনায় যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালার সংশোধন করা প্রয়োজন;

সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধন প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের সক্ষমতার তুলনায় সমিতির সংখ্যাধিক্য এবং ফলশ্রুতিতে সমবায় সমিতি টেকসই না হওয়া

- সমবায়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত জাতীয় সমবায় নীতিমালার প্রয়োজন;
- উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা ও কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন;
- সমবায় অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো যৌক্তিকীকরণ এবং অন্য ক্যাডারের সাথে সমন্বয় রেখে সমবায় ক্যাডার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি, পদ গ্রেড উন্নীতকরণ ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ. নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠান (সমবায় অধিদপ্তর)

- সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধন প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের সক্ষমতার তুলনায় সমিতির সংখ্যাধিক্য এবং ফলশ্রুতিতে সমবায় সমিতি টেকসই না হওয়া;
- সমবায় সমিতি নিবন্ধনের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা ও আন্তরিকতার অভাব;
- প্রকল্পভিত্তিক সমিতি সমবায়ের আদর্শে গঠিত না হওয়ায় টেকসই না হওয়া;
- সমিতির আর্থিক লেনদেন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা;
- আইন ও বিধির অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক হয়রানির অভিযোগ;
- সমিতি পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ যথাযথ ও আধুনিক না হওয়ায় গুণগত নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না অধিকন্তু নিরীক্ষকের দক্ষতার অভাব ;
- সমবায় সমিতির অডিট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র অডিট ইউনিটের অনুপস্থিতি;
- যথাযথ পরিদর্শন ও তদন্ত সম্পাদনে বিদ্যমান আইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা;
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পেশাদার ও দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব এবং অবকাঠামোগত সুযোগ–সুবিধা ও আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদির ঘাটতি;
- প্রয়োজনীয় জনবল ও Logistic support এর ঘাটতি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদোন্নতির সীমিত সুযোগ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বদলি/পোস্টিং সংক্রান্ত নীতিমালা অনুশীলনের অভাব;
- রাজনৈতিক চাপ মোকাবেলায় ও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কর্মকর্তাদের অক্ষমতা;
- অভিযোগ, তদন্ত, বিবাদ নিষ্পত্তি ও সমিতি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন না করা;
- অকার্যকর সমবায় সমিতি অবসায়ন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে না পারা।

সমবায়ী/ব্যবস্থাপনা কমিটি

- সমবায় সম্পর্কে সদস্যদের পর্যাপ্ত ধারণা না থাকা এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকা;
- সমবায় সমিতি পরিচালনায় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং সুযোগের অভাব;
- সমিতি পরিচালনায় যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মীর অভাব;
- সমবায় সদস্যদের সমবায়ী মানসিকতার পরিবর্তে দ্রুত আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার মানসিকতা;
- অসাধু ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার;
- সমবায় নেতৃত্বে অসমবায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অনুপ্রবেশ;
- সমিতি পরিচালনায় সমবায়ী নেতৃত্বের আইনগত ও পেশাগত দক্ষতা ও অঙ্গীকারের অভাব;
- সমিতিতে অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি;
- সদস্যদের বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে সমিতির আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান;
- ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্নীতি ও আর্থিক অব্যবস্থাপনা;
- সমবায় সমিতির সম্পদ আত্মসাৎ ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত সমবায়ী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যথোপযুক্ত শাস্তি না হওয়া;
- অর্থ লেনদেন বা সম্পদের ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব;
- রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় সমবায়ী নেতৃবৃন্দের যথাযথ আইনের প্রয়োগ থেকে পার পেয়ে যাওয়া;
- সদস্যদের মধ্যে সমবায় শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব;
- সমবায় পরিচালনায় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং সুযোগের অভাব।

ঝুঁকি থেকে উত্তরণের উপায়

ক. নীতিনির্ধারণী পর্যায়

- বাংলাদেশের সংবিধানে মালিকানা

খাত হিসেবে (অনুচ্ছেদ ১৩-খ) স্বীকৃত সমবায় খাতকে সরকারি উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা;

- সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় সমবায় খাতে সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;
- সমবায়ীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে শক্তিশালীকরণ;
- সমবায় অধিদপ্তরের শীর্ষ পদে সমবায় ক্যাডার থেকে কর্মকর্তা পদায়ন, জনবল বৃদ্ধিসহ সমবায় ক্যাডারের বিদ্যামান পদসমূহের গ্রেড উন্নতীকরণ ও লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি;
- সমবায় আইনকে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণ করা এবং অন্যান্য আইনের সাথে সমবায় আইনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা।

খ. নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠান পর্যায়

- সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী আধুনিক কারিকুলাম প্রণয়ন;
- সমবায়ভিত্তিক সরকারি নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন পূর্বক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে খাতভিত্তিক সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান ;
- সমবায় সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি, পরিদর্শন ও পরিচর্যা করার জন্য সময়োপযোগী ডাটাবেজ গঠন, ডিজিটাল মনিটরিং টুলস প্রণয়ন ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মানসম্মত হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন;
- সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর তদারকি নিশ্চিতকরণ;
- অনিয়মকারী ও আইন ভঙ্গকারী সমিতির বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শেয়ার, সঞ্চয়, আমানত গ্রহণ এবং ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের সুযোগ সম্প্রসারণ করা;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রণয়ন ও আর্থিক ঝুঁকি নির্ণায়কসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য সমবায় আইন, হিসাবরক্ষণ, আইজিএ ও নেতৃত্ব বিকাশের ওপর পর্যাপ্ত এবং সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল অর্থায়ন নয়, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা।
- হিসাবরক্ষণ, ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং অন্যান্য কার্যক্রমে ডিজিটাল সফটওয়্যার ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা;
- সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. সমবায় সমিতি পর্যায়

- সমবায় সদস্যদের মানসম্মত ও আধুনিক আর্থিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সমবায়ীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- সমবায়ের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে জনগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টি;
- সমবায় সমিতির দৈনন্দিন লেনদেন ও অন্যান্য হিসাবনিকাশ নিরীক্ষার সুবিধার্থে রিয়েল টাইম বেইজ হিসাবরক্ষণ সিস্টেম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং সমবায় সমিতির সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।
- সমিতির আয়ের উৎস, ব্যয় এবং বিনিয়োগের তথ্য সদস্যদের কাছে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;
- লেনদেনের স্বচ্ছতা বাড়াতে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং অনলাইন অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা;
- সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- নিয়মিত সভা এবং আলোচনায় সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া;
- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব এবং সুশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালী এবং ঝুঁকিমুক্ত হয়ে দেশের অর্থনীতিতে আরও বড় অবদান রাখতে পারবে।

সমাপনী মন্তব্য ও সুপারিশ

আলোচিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এটি সুস্পষ্ট যে, আর্থিক কাঠামো, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং নীতিমালার গুরুতর লঙ্ঘনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতিগুলো সদস্যদের আমানত এবং সামগ্রিক সমবায় আন্দোলনের প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাবে সমবায় সমিতি নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়তে পারে এবং সেই সাথে কারো স্বার্থে গঠিত কোনো সমিতি যেন সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে সদস্যদের প্রতারিত করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যর্থতা যেন কোনোভাবেই সমিতির ব্যর্থতা বা বিপর্যস্ততার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দ্রুত এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. সমবায় আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় কার্যক্রম সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সমবায়

সদস্যদের আমানত সুরক্ষায় সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা এবং সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

অধিদপ্তরকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. সমবায় আইনকে আরও যুগোপযোগী করে এর কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. অবিলম্বে সমিতির সকল অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা দরকার।

৪. সদস্যদের আমানত সুরক্ষায় সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা এবং সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৫. অতি ঝুঁকিপূর্ণ সমবায় সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবিলম্বে স্থগিত করে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক নিয়োগ করা দরকার।

৬. সকল অবৈধ ঋণ ও বিনিয়োগের উপর পূর্ণাঙ্গ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এবং অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৭. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কথা বিবেচনা করলে বর্তমান সমবায় সমিতির সংখ্যা অতিরিক্ত বলে প্রতীয়মান হয়, কাজেই অকার্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ সমিতিগুলোকে সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক বাতিল করে সমিতির সংখ্যা যৌক্তিকভাবে কমিয়ে ফেলতে হবে।

৮. সমবায় সমিতি অকার্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে সদস্যদের আগে থেকেই সতর্ক করার জন্য প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশাল মিডিয়া, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে নিয়মিত ও কার্যকরভাবে জনসচেতনতামূলক প্রচার করতে হবে।

৯. নিবন্ধন প্রদানকালে সদস্যদের আমানত, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য "নিবন্ধনের শর্তাদি" হিসেবে উপযুক্ত শর্তাদি আরোপ করতে হবে।

১০. সমবায় সমিতির জন্য "আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান" নীতিমালা এবং "তহবিল বিনিয়োগ" নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সমবায় আইনের ২৬(খ) ধারায় "আমানত সুরক্ষা তহবিল" গঠনের বিধান থাকলেও সমবায় বিধিমালায় এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত বিধানাবলি জারি করা হয়নি। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ বিধান জারিও কার্যকর করতে হবে।

১১. সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে অবারিত না রেখে তা সীমিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১২. যে সকল সমবায় সমিতি সাধারণ জনগণের আমানত নিয়ে পালিয়ে গেছে বা সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে বা আমানতের অর্থ ফেরত দিচ্ছে না সেসকল সমিতির তালিকা এবং দায়ী ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা, সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণ, সদস্যদের অর্থ ফেরতের জন্য জোরালো উদ্যোগ, ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম প্রতিরোধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

১৩. সমবায় সমিতি নিবন্ধন, তদন্ত, পরিদর্শন, নিরীক্ষা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ কাজ এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারী বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে দায়িত্ব অবহেলা, অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. সমবায় অধিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী ও দক্ষ করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো যৌক্তিকীকরণ এবং অন্য ক্যাডারের সাথে সমন্বয় রেখে সমবায় ক্যাডার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি, পদ গ্রেড উন্নীতকরণ ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা নিয়মিতভাবে সমিতিগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং অনিয়ম রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

এ সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে ও সময়মতো বাস্তবায়িত হলে সমিতির ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে ও ভবিষ্যতে সমবায় খাতকে এ ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যাবে এবং সামগ্রিকভাবে সমবায় খাতের প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারেও সহায়ক হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা ও তদারকি এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

■ জেবুন নাহার: অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সাম্য ও সমতার বাংলাদেশে
সমবায়ের কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর

হরিদাস ঠাকুর

সাম্য ও সমতার সমবায় প্রত্যাশা

‘সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়’-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। সমবায়ীদের একটি পতাকাতলে এনে উন্নয়নের ধারায় সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমবায়ের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন অর্জনের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৭২ খ্রি. থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে জাতীয় সমবায় দিবস। সমবায়ীদের কাছে দিবসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সমবায় একটি সম্মিলিত শক্তি। এই শক্তির দ্বারা এর সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্পাদিত হয়। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সংঘটিত ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ‘সাম্য ও সমতার বাংলাদেশ’ গড়ার কর্মযজ্ঞে সমবায় অধিদপ্তর যথাযথ ভূমিকা পালনে অগ্রণী ভূমিকায় অগ্রসর হবে- ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবসে এটাই হোক উজ্জীবনের মন্ত্র।

সমবায় মানে সম্মিলিত অগ্রযাত্রা

সমবায়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Cooperative. Cooperative শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Cooperari থেকে। এখানে ‘পড়’ এর অর্থ ‘সাথে’ (with) এবং ‘operari’ শব্দের অর্থ ‘কাজ করা’ (to

work)। সুতরাং Cooperari শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একসাথে কাজ করা। (working together). সমবায়ের ব্যুৎপত্তিগত দর্শন ও চেতনার আলোকে 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা সমবায়ের তিনিটি ভিন্ন ধরনের সংজ্ঞাকে আমলে নিতে পারি। এ তিনটি ভিন্ন দ্যোতনার সমবায় সংজ্ঞা হচ্ছে:

ক. সমবায় সমিতি হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন গণতান্ত্রিক, স্বাধীন, সার্বভৌম একটি আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান। (Cooperative society is a quality democratic, autonomous socio-economic Organization.)

খ. সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators for their socio-economic development.)

গ. সমবায় হচ্ছে সততানির্ভর নৈতিকতাকেন্দ্রিক মূল্যবোধচালিত সদস্যদের ভালোবাসাময় আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পরিক উদার ও নিঃশর্ত ভালোবাসা নেই, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নেই-সেখানে আর যাই থাক, সমবায় থাকতে পারে না। সমবায়ের বন্ধন মানেই নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধযুক্ত ভালোবাসার বন্ধন।

সমবায়ের সুবিস্তৃত পরিধি ও করণীয়

সমবায় গবেষকদের বিশ্লেষণে সমবায়ে সুবিস্তৃত পরিধির যে চিত্র পাওয়া যায়, তা কার্যকর করতে হলে অনেকগুলো পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। এগুলো হলো-

১. সর্বপ্রথম দরকার সমবায় চেতনার বিকাশ, সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও সমবায় গ্রুপ গঠন।

প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি সফল ও সামর্থ্যবান সমবায় সমিতি গঠন করা যারা এলাকার সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতিকে চাহিদাভিত্তিক সহায়তা প্রদান করবে।

২. সমবায় গ্রুপ গঠনের আগে আবশ্যিক প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যোগ্য, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব নির্বাচন এবং 'Principal-Agent-Problem' যাতে না হয় তার জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান প্রণয়ন।

৩. ব্যক্তিখাতের আক্রমণ ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের আক্রমণ থেকেও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করা।

৪. সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্ব সমবায় আন্দোলন বিকাশের একটি পূর্বশর্ত।

৫. সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর দেশব্যাপী শাখা-প্রশাখাসহ বিস্তৃতি, গভীরতা বৃদ্ধি এবং আয়তনিক বিকাশের (Up Scalling) ব্যবস্থা ও আইনী সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

৬. সমবায় সমিতির জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

৭. সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাস্তবধর্মী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সমবায় অধিদপ্তরের পরামর্শকের ভূমিকার পাশাপাশি কার্যকর সহায়কের ভূমিকা পালন।

৮. প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি সফল ও সামর্থ্যবান সমবায় সমিতি গঠন করা যারা এলাকার সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতিকে চাহিদাভিত্তিক সহায়তা প্রদান করবে।

বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ থেকে উপলব্ধি করা যায়: টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমতাভিমুখী উন্নয়ন আর সমতাভিমুখি উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমবেত উন্নয়ন এবং সমবেত উন্নয়নের আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে সমবায়ের উন্নয়ন।

সাম্য ও সমতার আদর্শে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের দর্শন

উদারনীতি, বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর মানুষের গভীর বিশ্বাস থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭১ সালে যে মূল্যবোধকে বুকে ধারণ করে আমাদের গণমানুষ যুদ্ধ করেছিল, সেই মূল্যবোধকে ২০২৪ সালে আমাদের 'জেনারেশন জি' (প্রজন্ম জি) নতুনভাবে দেখতে শিখিয়েছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মহান স্বাধীনতা অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'স্বাধীনতা' আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষার নাম। বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের পথপরিক্রমায় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম 'স্বাধীনতা'। দীর্ঘ ২৩ বছরের মুক্তির সংগ্রাম এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মাধ্যমে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভেঙে আমরা ছিনিয়ে এনেছি একটি নতুন ভূখণ্ড, একটি নতুন মানচিত্র, একটি নতুন পতাকা। পেয়েছি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার এক মহান উজ্জীবনী শক্তি।

২০২৪ সালে বাংলাদেশ নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়েছে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে। আমাদের ছাত্র ও

বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কর্মসোপানে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তরকে সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। এই এগিয়ে যাওয়াটা সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে আবশ্যক।

যুবসমাজের আন্দোলন প্রথমদিকে মূলত ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এরপর সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে কীভাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ একনায়কতন্ত্র, নিপীড়ন, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজপথ এবং সামাজিক-যোগাযোগ মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের ছাত্রজনতা তাদের অদম্য সংকল্প ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে। তাঁদের এই সম্মিলিত সংকল্পের মধ্যেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিহিত, যা এ দেশটিকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে একটি দায়িত্বশীল জাতির মর্যাদায় উন্নীত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমাদের এই তরুণরা যে প্রজ্ঞা, সাহস ও প্রত্যয় দেখিয়েছে তা বিশ্বকে অভিভূত করেছে। বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করেও, বুক পেতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের এই তরুণরা। অবৈধ রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিল আমাদের তরুণীরা। স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা নিঃশঙ্কচিত্তে উৎসর্গ করেছিল তাঁদের জীবন। শত শত মানুষ চিরতরে হারিয়েছে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি। আমাদের মায়েরা, দিনমজুরেরা ও শহরের অগণিত মানুষ তাঁদের সন্তানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছিল রাজপথে। তপ্ত রোদ, বৃষ্টি, মৃত্যুভয়কে তোয়াক্কা না করে তারা সত্য ও ন্যায়সংগত আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালনা করার অশুভ ষড়যন্ত্রকে পরাভূত করেছিল।

এই গণআন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার ও উন্নয়নের সুবিধাবঞ্চিত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব চেয়েছিল। আমাদের জনগণ একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, যার জন্য আমাদের নতুন প্রজন্ম জীবন উৎসর্গ করেছিল। 'সকল প্রকার বৈষম্যহীনতা'ই নতুন বাংলাদেশের দর্শন।

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সাথে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এসব নির্দেশনার মৌল বার্তা হচ্ছে দেশের মালিক জনগণকে 'সকল প্রকার বৈষম্য' থেকে মুক্ত করা। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার জনগণবান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব এসব নির্দেশনা হলো :

১. সরকারের সব পর্যায়ে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে 'মার্চিং অর্ডার' (এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ) প্রদান।
২. নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য গৎ-বাঁধা চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে, চিন্তার সংস্কার করে, সৃজনশীল উপায়ে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
৩. দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে জনগণের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।
৪. সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৫. প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার কর্মসূচির সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা দাখিল করবে।
৬. ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, দেশের স্বার্থে তাকে কাজে লাগাতে হবে।
৭. 'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' তৈরি করতে হবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনাসমূহকে বিশ্লেষণ করলে 'সাম্য ও সমতার আদর্শে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের কয়েকটি প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো হলো :

১. দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ;
২. দেশের জনগণের জীবনমান হবে উন্নত;
৩. গণমুখী সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন নিয়ামক হবে;
৪. সমবায় হতে পারে স্বপ্নের বৈষম্যহীন বাংলাদেশের উৎস;
৫. সমবায়ের জাদুস্পর্শে জাগরিত হবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণ।
৬. সুপ্ত গ্রাম বাংলার জাগরণেই বাংলার জনগণের জীবন মুখরিত হবে।
৭. নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় উদ্বেলিত হবে বাংলাদেশ।

সাম্য ও সমতাসিক্ত বৈষম্যহীন বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সমবায়ের অংশগ্রহণ

বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কর্মসোপানে অগ্রসরমান

বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তরকে সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। এই এগিয়ে যাওয়াটা সময় (Time driven), চাহিদা (Demand driven) ও প্রয়োজনের নিরিখে (Situation driven) আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে সমবায় অধিদপ্তরকে তিনটি কর্মপ্রত্যয় সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে:

১. সমবায়কে শুধু তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না করে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই যাতে নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
২. বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে যাতে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থসামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
৩. 'সাম্য ও সমতার বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' চেতনার সাথে তাল মেলাতে সমবায়কে যুগোপযোগী কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত করা।

'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'- কর্মযজ্ঞে সমবায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুঁজে বের করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ কর্মযজ্ঞে সমবায় অধিদপ্তরের 'পরিকল্পনা ও করণীয়' এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

১. সমবায় সেক্টরে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও পণ্য পৌঁছানো।
২. সমবায়ীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা।
৩. 'আন্তঃসমবায় সহযোগিতা' সমবায় মূলনীতির বাস্তবায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায়ীদের অনলাইন প্লাটফর্মে এনে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার লিংকেজ গড়ে তোলা।
৪. নতুন নতুন ক্ষেত্রে (যেমন: গার্মেন্টস সেক্টর, প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদন, স্কুল কো-অপারেটিভ, ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ হেলথ কো-অপারেটিভ ইত্যাদি) সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে সম্প্রসারণ করে এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটানো।
৫. সমবায় অধিদপ্তরের জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষিত করে 'সাম্য ও সমতার বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'-এর উপযোগী করে গড়ে তোলা।

উন্মোচিত হোক সমবায়ের নতুন দিগন্ত

সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে 'আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি'র মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আছে 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' বিনির্মাণের জন্য আত্মত্যাগকারী ছাত্র-জনতার মহান আত্মত্যাগ। আমাদের তাই সমবায়কে নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে।

সমবায়ের আছে আর্থসামাজিক সকল উন্নয়ন নিয়ামক। আমরা জানি সমবায় হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় পাঁচটি মূলধন ১. আর্থিক মূলধন; ২. মানবিক মূলধন; ৩. সামাজিক মূলধন; ৪. প্রাকৃতিক মূলধন এবং ৫. ভৌত মূলধন এর সঠিক ব্যবহারের হাতিয়ার। আবার সংজ্ঞাগত দিক থেকে সমবায় হচ্ছে উন্নয়নের সম্মিলিত হাতিয়ার। কারণ: 'সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের ঐক্য বা একতার মাধ্যমে সংগঠিত একটি স্ব-শাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন সংগঠন, যা ঐ জনগোষ্ঠীর সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বা উচ্চাভিলাষ পূরণের লক্ষ্যে যৌথ মালিকানা, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পেশাদারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত।' (An association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common end through the formation of a democratically controlled organi "ation, making equitable contributions to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking, in which members actively participate.- ILO definition"

সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বান-কি-মুন সমবায় সম্পর্কে বলেছিলেন: Co-operatives are a reminder to the international community that it is possible to pursue both economic viability and social responsibility. সমবায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অর্থনৈতিক মুনাফা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা একই সাথে অর্জন সম্ভব।' আবার আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) এর তৎকালীন সভাপতি Dame Pauline Green বলেছিলেন : 'সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে- লোভ মেটানোর কাজ করে না। (Meeting Human Need, Not Just Human Greed). উভয় বক্তব্যই আমাদের সমবায়ের বৈষম্যহীনতার কথাই তুলে ধরে।

'সাম্য ও সমতার বৈষম্যহীন বাংলাদেশে'র উন্নয়ন দিগন্তে সমবায়ের নিজস্ব শক্তি ও চেতনার স্ফূরণ প্রকাশে সমবায় অধিদপ্তরকে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও কর্মযজ্ঞ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে- এটাই ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের মৌল অগ্রাধিকার হোক।

■ হরিদাস ঠাকুর: উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সাবেক যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

চীনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ উপলক্ষ্যে, ICA-AP-ACFSMC — কর্মশালার কিছু অভিজ্ঞতা

মোঃ সাহাদৎ হোসেন

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য সমবায় উদ্যোক্তা তৈরি ও উপযুক্ত বাস্তুসংস্থান প্রতিষ্ঠা—এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নিয়ে জাতিসংঘ ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে পালন করছে। International Year of Cooperatives-IYC উদযাপন উপলক্ষ্যে All-China Federation of Supply and Marketing Cooperatives (ACFSMC) এবং ICA-AP যৌথভাবে ২২–২৬ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত চীনের গুয়াংজুতে "Workshop on Sustainable Development and Capacity building of Cooperatives" এর আয়োজন করে। টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের সফলতার দৃষ্টান্ত, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ICA-AP সদস্যগণের মধ্যে সহযোগিতা বিনিময়, সমবায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। সমবায়ের বহুমাত্রিকতার আলোকে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১০টি দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতির ৩৩ জন প্রতিনিধি, ICA-AP এর আঞ্চলিক পরিচালক, Lead-Communication and Membership Development, AP এবং চীন, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপানের সমবায় আন্দোলনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তৃণমূল মানুষের সাথে কার্যকর যোগাযোগ, সহযোগিতা, কারিগরি অভিজ্ঞতা

বিনিময়, শিক্ষা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের মেলবন্ধন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। সমবায়ের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানের উপায় অন্বেষণ, সামর্থ্য, চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ণয় এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমবায়ের সফলতা নিহিত।

কর্মশালায় প্যানেল আলোচনা, Interactive আলোচনা, বিভিন্ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন, কেস স্টাডি প্রভৃতির মাধ্যমে চীনের সফল সমবায় আন্দোলনকে তুলে ধরা হয়। Innovation এবং Inter-Cooperation এর মাধ্যমে চীনের কটন ইন্ডাস্ট্রিজ সমগ্র দেশের কটন উৎপাদন, বিপণন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রান্তিক কৃষককে শতভাগ ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে পেরেছে। তাছাড়া মালয়েশিয়ার AKGKASA, ফিলিপিন্স এর NATCCO, ভিয়তেনামের VCA সমবায় অঙ্গনে দারুণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ন্যায্যতা, দীর্ঘমেয়াদি Resilience তৈরি প্রভৃতি এবারের IYC-২০২৫ কর্মশালায় তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন দেশের সমবায়ের ধরন, সমবায়ের দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন, আইনি কাঠামো, কর্মকাণ্ড, চ্যালেঞ্জসমূহ, সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক মডেল, Community engagement এর বিভিন্ন কৌশল, ব্যবসায়ী মডেল উপস্থাপন করা হয়। Digitalization, e-commerce, smart agriculture, green technology, New Cooperative Lead enterprises, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সম্প্রসারণ, কারিগরি ও সামাজিক বিষয়াদি, আইন, বিধি, নিয়ন্ত্রণ, digital access, যুবসমাজের অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু অভিঘাত প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে কিভাবে উন্নয়নকে টেকসই করা যায় তা আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আর্থিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণ, সঞ্চয়-বিনিয়োগের আগ্রহ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, পণ্যের মূল্য সংযোজন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃচাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদন, সরবরাহ বৃদ্ধি প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিকে বিপুল সম্ভাবনাময় করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন খাত সংযুক্ত হচ্ছে। যা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রসারিত হচ্ছে।

দেশের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে সমবায় উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি, শিল্প উৎপাদন, ম্যানুফাকচারিং, ব্যবসা, পরিবহন সেবা, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড উদ্যোগে প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা পূরণ প্রভৃতিতে সমবায়ের বিকল্প নেই। তেমনি দেশের সার্বিক উন্নয়নে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সমবায় উদ্যোগের কেউ সমকক্ষ নেই। আমাদের দেশের নিম্ন আয়ের কর্মজীবীদের সংগঠিত করে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিজাত পণ্য, বনজ সম্পদ, সেবা খাত, উৎপাদন, বিপণন ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন সম্ভব। আমাদের দেশে বাজার ব্যবস্থাপনা বেশ দুর্বল। এখানে মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল, ফরিয়াদের দৌরাত্ম্যের কারণে উৎপাদনকারী তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। সমবায়ের ভিত্তিতে বিপণন সুযোগ তৈরি, যৌক্তিক ও লাভজনক মূল্যে বাজারজাতকরণে সমবায় সমিতি অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। নিয়মিত সফলতা ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে কর্মকৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সমবায়ের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব। অনেক সময় সমবায় উদ্যোগ প্রারম্ভিক সাফল্য অর্জন করলেও সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত প্রণোদনা, যোগাযোগের ঘাটতি, এককেন্দ্রিক ক্ষমতা, অযোগ্য ব্যক্তির পদপ্রাপ্তি, অগণতান্ত্রিক চর্চা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অসততা, অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব প্রভৃতি কারণে সমবায়ের মহতি উদ্যোগ ও সাফল্য ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হয়। সময়ের চাহিদার আলোকে সমবায় ব্যবস্থার পর্যালোচনা, গবেষণা ও সময়োপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে সমবায়ের সফলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সমবায় সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। সমিতির কর্মকাণ্ডে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ সফল করতে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। যেকোনো উদ্যোগের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সদস্যদের স্পষ্ট ধারণা সবাই একাত্ম প্রদান করতে হবে ও অনুপ্রাণিত হয়ে উৎসাহ ও সতর্কতার সাথে অগ্রসর হলেই সমবায় আন্দোলন সফল হবে।

সমবায় সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। সমিতির কর্মকাণ্ডে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ সফল করতে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই।

■ মোঃ সাহাদৎ হোসেন: মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ ও উপসচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষি সমবায় নীতি — এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ

ড. আব্দুল্লাহেল বাকী ও ড. রাজেশ চক্রবর্ত্তী

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। শস্য উৎপাদন, মাছ চাষ, পশুপালন, পাখিপালন এবং নার্সারি কার্যক্রম গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদন্ড হিসেবে কাজ করে। কিন্তু প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন খরচ বেশি, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, বাজারজাতকরণে অসুবিধা দেখা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক ন্যায্যমূল্য পায় না। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূর হয় না এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকে। এই সমস্যার টেকসই সমাধান হতে পারে সমবায়ভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। সমবায়ের নীতি হলো সাম্য, সমতা, স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা। আর AI ও A4 প্রযুক্তি কৃষিকে তথ্যভিত্তিক, কার্যকর ও টেকসই করে তুলতে পারে। এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে কীভাবে সমবায় ব্যবস্থার আলোকে কৃষি খাতে AI ও A4 প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন সম্ভব।

সমবায় আন্দোলন ও কৃষি উন্নয়ন

সমবায় সমিতি হলো এক ধরনের অর্থনৈতিক সংগঠন যেখানে কিছু মানুষ সমানভাবে অর্থ, শ্রম

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে জমি খণ্ডিত, উৎপাদন সীমিত এবং কৃষকের পুঁজি কম। এই পরিস্থিতিতে সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম- যেমন যৌথ জমি চাষ, সমবায়ভিত্তিক মাছ চাষ, নার্সারি পরিচালনা, পোলট্রি বা গবাদিপশু পালন কৃষকদের শক্তিকে একত্রিত করে।

ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যৌথভাবে উৎপাদন ও বণ্টন করে। এর মূল লক্ষ্য হলো সদস্যদের ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, মধ্যস্বত্বভোগীকে দূর করা এবং অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা। সমবায় হলো "সবার জন্য সবার দ্বারা" উন্নয়ন। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন নতুন কিছু নয়। তবে এর কার্যকারিতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে এর সমন্বয় এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে জমি খণ্ডিত, উৎপাদন সীমিত এবং কৃষকের পুঁজি কম। এই পরিস্থিতিতে সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম- যেমন যৌথ জমি চাষ, সমবায়ভিত্তিক মাছ চাষ, নার্সারি পরিচালনা, পোলট্রি বা গবাদিপশু পালন কৃষকদের শক্তিকে একত্রিত করে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা-

১. ছোট কৃষকরা একত্রিত হয়ে বড় আকারে জমি চাষ করতে পারবে।
২. আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন- কম্বাইন্ড হারভেস্টার, পাওয়ার টিলার, ড্রোন-ভিত্তিক স্প্রে মেশিন যৌথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।
৩. সহজে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারে
৪. লাভ সমানভাবে ভাগাভাগি করতে পারবে ও কৃষক ন্যায্যমূল্য পাবে। ফলে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

AI ও A4 প্রযুক্তির সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা

Artificial Intelligence (AI) হলো এমন প্রযুক্তি যা মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেয়, বিশ্লেষণ করে ও পূর্বাভাস দেয়। কৃষিতে AI ব্যবহার হয়-

- ফসল রোগ শনাক্তকরণে
- আবহাওয়ার পূর্বাভাসে
- স্মার্ট কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ও বাজারদর বিশ্লেষণে
- সাইট স্পেসিফিক ব্যবস্থাপনা
- সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- পশু ও পাখির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে

Agriculture 4.0 (A4) হলো আধুনিক কৃষি বিপ্লব যেখানে Internet of Things (IoT), ড্রোন প্রযুক্তি, রোবোটিক্স, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, ব্লকচেইন এবং স্মার্ট মেশিনারি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি আরও স্মার্ট, টেকসই ও লাভজনক হয়।

শস্য উৎপাদনে AI ও A4 এর ব্যবহার

বাংলাদেশে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডালসহ নানা শস্য উৎপাদন হয়। AI ও A4 প্রযুক্তি ব্যবহার করে-

১. ফসল পর্যবেক্ষণ: ড্রোন ও স্যাটেলাইট ইমেজিং দ্বারা মাঠের অবস্থা পর্যবেক্ষণ।
২. সার ও পানি ব্যবস্থাপনা: স্মার্ট সেন্সর দ্বারা মাটির উর্বরতা ও আর্দ্রতা পরিমাপ।
৩. রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ: AI-ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ দ্বারা রোগ শনাক্তকরণ।
৪. বাজার বিশ্লেষণ: সমবায়ভিত্তিক গুদাম, কোল্ডস্টোরেজ ও মিল স্থাপন করে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও মূল্য সংযোজন সম্ভব। বিগ ডেটা ব্যবহার করে কোনো মৌসুমে কোনো ফসলের দাম বেশি হবে তা পূর্বাভাস।

সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকরা যৌথভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচ কমবে, ফলন বাড়বে এবং লাভ সবার মধ্যে ভাগ হবে।

মৎস্য চাষে AI ও A4 এর ব্যবহার

বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে বিশ্বে অন্যতম শীর্ষ দেশ। তবে মাছ চাষে অনেক সমস্যা দেখা দেয় যেমন পানির গুণগত মান বজায় রাখা, রোগবালাই, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি। সমবায়ভিত্তিক মৎস্য চাষ করলে ছোট খামারিরা একত্রে বড় জলাশয় ব্যবহার করতে পারবে। বায়োফ্লক প্রযুক্তি ও আরএএস (Recirculating Aquaculture System) প্রয়োগ করে সীমিত জায়গায় বেশি মাছ উৎপাদন সম্ভব। সমবায়ের অধীনে মাছ প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করলে কৃষক ও খামারিরা সরাসরি লাভবান হবে।

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব

১. স্মার্ট পানি ব্যবস্থাপনা: সেন্সর দিয়ে অক্সিজেন লেভেল, পিএইচ, তাপমাত্রা মাপা।
২. খাদ্য ব্যবস্থাপনা: AI ভিত্তিক ফিড মেশিন যা সঠিক পরিমাণ খাবার সরবরাহ করে।
৩. রোগ পূর্বাভাস: AI সফটওয়্যার দিয়ে মাছের চলাফেরা ও আচরণ বিশ্লেষণ করে রোগ শনাক্তকরণ।
৪. বাজার সংযোগ: ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রির সুযোগ।

সমবায়ভিত্তিক মাছ চাষে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদন ও আয় উভয়ই

বৃদ্ধি পাবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে।

পশুপালনে AI ও A4 এর ব্যবহার

- গবাদি পশুপালন গ্রামীণ অর্থনীতির বড় খাত। গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি হচ্ছে দুধ, মাংস ও চামড়ার উৎস।
- দুধ উৎপাদন, দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ (ঘি, মাখন, চিজ) সমবায়ভিত্তিক কারখানায় প্রস্তুত করা সম্ভব।
- সমবায়ভিত্তিক খামারে আধুনিক ইনকিউবেটর, ফিড মেশিন, বায়োসিকিউরিটি সিস্টেম ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো যাবে।

১. ডিজিটাল হেলথ মনিটরিং: AI দ্বারা পশুর দেহে সেন্সর লাগিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায়।
২. স্মার্ট ফিড ম্যানেজমেন্ট: কোনো পশুর কত খাবার দরকার তা AI দ্বারা নির্ধারণ করে দিতে পারে।
৩. দুধ সংগ্রহ ব্যবস্থা: স্বয়ংক্রিয় দুধ দোহন মেশিন ব্যবহার করে দুধ সংগ্রহ করা যায়।
৪. বাজার বিশ্লেষণ: কোনো সময়ে গরুর দাম বেশি হবে তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

সমবায়ভিত্তিক খামার গড়ে তুললে কৃষকরা যৌথভাবে পশু পালন করতে পারবে, AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম খরচে বেশি লাভ তুলতে পারবে। ফলে গ্রামীণ নারী ও যুবসমাজের ভাইবোনেরা পশুপালন করে উদ্যোক্তা হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

পাখিপালনে AI ও A4 এর ব্যবহার

বাংলাদেশে পোলট্রি শিল্প কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র।

১. স্মার্ট হ্যাচারি: IoT ভিত্তিক ডিভাইস দিয়ে ডিম ফোটার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা।
২. রোগ নির্ণয়: AI অ্যাপ দিয়ে মুরগির রোগ শনাক্তকরণ।
৩. স্বয়ংক্রিয় ফিডিং ও ক্লিনিং সিস্টেম।
৪. বাজার চেইন উন্নয়ন: ভোক্তার কাছে সরাসরি বিক্রয়।

সমবায়ভিত্তিক পোলট্রি খামার ছোট উদ্যোক্তাদের একত্রিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

নার্সারিতে AI ও A4 এর ব্যবহার:

- নার্সারি শিল্প ফুল, ফল ও ঔষধি গাছ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- সমবায়ভিত্তিক নার্সারি থেকে মানসম্মত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা উৎপাদন ও বিক্রি করা যাবে।
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানসম্মত কলা, আলু, ফুল ইত্যাদির চারা উৎপাদন সম্ভব। সমবায় সমিতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চারার বিপণন করলে দেশের ভেতর ও বাইরে রপ্তানি করা যাবে।

১. স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা: মাটির আর্দ্রতা অনুযায়ী পানি সরবরাহ।
২. AI ভিত্তিক পেস্ট কন্ট্রোল।
৩. বাজার সংযোগ: ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে বিক্রি।
৪. গাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ: সেন্সর ও ক্যামেরা দিয়ে গাছের বৃদ্ধির গতি পরিমাপ।

সমবায়ভিত্তিক নার্সারি ব্যবসা নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করবে এবং নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ

AI ও A4 প্রযুক্তি কৃষিতে ব্যবহার করা হলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে, খরচ কমবে এবং ন্যায্য বাজারমূল্য পাওয়া যাবে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষকরা সমানভাবে উপকৃত হবে। এর ফলে-

১. সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবে।
২. প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে।
৩. বাজারজাতকরণে সমবায় মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমাবে।
৪. আয় বৃদ্ধি পেলে কৃষক পরিবারগুলো দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হতে পারবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

AI ও A4 প্রযুক্তি শুধু উৎপাদনে নয়, প্রযুক্তি

ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে। যেমন-

১. সমবায়ভিত্তিক খামার, নার্সারি ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হবে।
২. যুবসমাজ সমবায়ের মাধ্যমে আইটি-ভিত্তিক কৃষি ব্যবসা শুরু করতে পারবে।
৩. নারী উদ্যোক্তারা পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, নার্সারি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পে যুক্ত হয়ে আয় করতে পারবে।
৪. ড্রোন অপারেটর তৈরি হবে।
৫. ডেটা অ্যানালিস্ট তৈরি হবে।
৬. স্মার্ট যন্ত্রপাতি মেইনটেন্যান্স কর্মী তৈরি করা সম্ভব।
৭. ডিজিটাল মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ তৈরি হতে পারে।

এছাড়া সমবায়ভিত্তিক চাষে অনেক মানুষের যৌথ অংশগ্রহণ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন

কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরি হবে যখন কৃষকেরা সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন থেকে অতিরিক্ত লাভবান হবে। AI ও A4 প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তারা-

১. সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যৌথভাবে বড় আকারের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।
২. কৃষিভিত্তিক স্টার্টআপ গড়ে উঠবে।
৩. ব্যাংক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সমবায়ের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যাবে।
৪. প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়বে।
৫. এগ্রি-টেক কোম্পানি তৈরি হবে।
৬. ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হবে।
৭. ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা সম্ভব হবে।

চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে AI ও A4 প্রযুক্তি কৃষিতে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে-

১. কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সীমিত ও সচেতনতার অভাব রয়েছে।
২. প্রাথমিক বিনিয়োগ ব্যয়বহুল ও নীতি সহায়তার ঘাটতি রয়েছে।
৩. অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও বাজার ব্যবস্থাপনায় দালালদের প্রভাব রয়েছে।
৪. সর্বোপরি দুর্বল নেতৃত্ব ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

করণীয়

১. সরকারি পর্যায়ে সমবায়ভিত্তিক কৃষি প্রকল্প চালু করা।
২. কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করা।
৩. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সমবায় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৪. গ্রামীণ আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা।
৫. কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান উন্নয়ন করা।
৬. সরকারি ও বেসরকারি সহায়তায় প্রযুক্তি ভর্তুকি দেওয়া।
৭. ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন করা।
৮. সমবায়ভিত্তিক মডেলকে জাতীয় কৃষি নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

উপসংহার

বাংলাদেশের কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পাখিপালন ও নার্সারি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তোলা হলে গ্রামীণ অর্থনীতি নতুন মাত্রা পাবে। এতে ক্ষুদ্র কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবে, দারিদ্র্য কমবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। অতএব বলা যায়- সাম্য ও সমতার ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলন ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ই টেকসই কৃষি উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের মূলপথ। বাংলাদেশের কৃষি খাতকে আধুনিক, লাভজনক ও টেকসই করতে হলে সমবায় আন্দোলনের নীতি এবং AI ও A4 প্রযুক্তি এর সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ, এর মাধ্যমে কৃষকরা একদিকে ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা পাবে, অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। শস্য, মৎস্য, পশুপালন, পাখিপালন, নার্সারি- সবখানেই এই প্রযুক্তি দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন “কেউ পিছিয়ে থাকবে না”- এই লক্ষ্য অর্জনে সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম ও AI-A4 প্রযুক্তির যুগল প্রয়াস হবে টেকসই কৃষি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিশারী।

■ ড. আব্দুল্লাহেল বাকী ও ড. রাজেশ চক্রবর্তী: কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৭।

বৈষম্য থেকে সমতায়
—— মানবিক অর্থনীতির সন্ধান

খ. ম. রেজাউল করিম

সমবায় আন্দোলন দেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জাতীয় সমবায় দিবস বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত একটি জাতীয় দিবস। মূলত সমবায় সম্পর্কে জনগণকে জানানো, সচেতন করা এবং সমবায় আন্দোলনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার দেশব্যাপী দিবসটি উদযাপন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"। এই স্লোগানের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, সমবায় উদ্যোগে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন এবং উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব। স্লোগানটি দেশের সমবায় খাতকে উৎসাহিত করতে এবং সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামাজিকভাবে উন্নত একটি বাংলাদেশ গড়ার প্রতি জাতীয় প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

সাম্য ও সমতা নতুন কোনো বিষয় নয়। এর উৎপত্তি মূলত আদিম সমাজ গঠনের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। নবপোলীয় যুগে কৃষিকাজসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। সেই ঐক্যের বন্ধনে গুরুত্ব পায় সামাজিক সাম্য, সমতা ও ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ। অনেকের মতে, ফরাসি বিপ্লবই সর্বপ্রথম সাম্য ও সমতার বাণীকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে, তবে অর্থনৈতিক সাম্য দেখা যায়নি। কারণ পুঁজিবাদী সমাজ অর্থনৈতিক সমতার বিষয়ে তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কারণ অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনেকটাই সংকটময় অবস্থায় উপনীত হতে পারে (পারভীন, ২০১৮)। তবে সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাম্য ও সমতা অপরিহার্য, যেখানে সাম্য সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা নিশ্চিত করে এবং সমতা সমাজের অনগ্রসরদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমাজের মূলধারার সদস্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসে। এই নীতিগুলো সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা ও স্থিতিশীল

সমাজ গঠনের ভিত্তি, যা সমাজে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করে এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করে থাকে। অর্থাৎ সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলে।

সাম্য

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব"। যে ব্যক্তি সমাজে বাস করে না, সে হয় দেবতা না হয় পশু। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের সাথে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসে এবং সমাজের অংশ হিসেবেই তার বিকাশ ঘটে (অধিকারী, ১৯৯৫)। অর্থাৎ জন্মগতভাবেই মানুষ সমাজে বসবাস করছে, যা সাম্যের ভিত্তি। জানা যায়, সামাজিক জীবনে সাম্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়েছে দাস সমাজ সৃষ্টির ঐতিহাসিক কাল থেকে। অন্য এক তথ্যমতে, বৈষম্য সৃষ্টির শুরু থেকেই সাম্য সংক্রান্ত চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করে। সাম্য অর্থ সমান। কিন্তু সমাজে সকল মানুষ সমান নয় বা সমান হওয়া সম্ভবও নয়। সাম্য বলতে বোঝায় কোনো বৈষম্য ছাড়াই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার নিশ্চয়তা। সাম্যের ধারণা, মোটা দাগে নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকারসমূহে সমতা নিশ্চিতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অপরপক্ষে সমাজবিজ্ঞানীরা সাম্য বলতে এমন একটি সামাজিক অবস্থাকে বোঝান যেখানে সমাজের সকল ব্যক্তির সমান সুযোগ, অধিকার, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা থাকে এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ লাভ করে। এটি কেবল আনুষ্ঠানিক বা আইনি সমতা নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার একটি ধারণা। সমতা যেখানে সবার জন্য একই সুযোগ সরবরাহ করে, সেখানে সাম্য নিশ্চিত করে যে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সমান সুযোগ পায়। অর্থাৎ সমাজে সবাই যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ পাবে এবং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য কারো চেয়ে কম বা বেশি সুবিধা ভোগ করবে না। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাম্য বলতে সমান করে নেয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। দার্শনিক জন লকের দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল সাম্য। মোটকথা জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকে সাম্য বলে। কারও জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না থাকা এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার নামই সাম্য। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির মতে, "সাম্য হলো সেই সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা, যাতে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার স্বার্থে বিসর্জন দিতে না হয়।" সাম্য সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সমবণ্টনের ব্যবস্থা করে। স্বাধীনতা উপভোগের জন্য সাম্যের প্রয়োজন পড়ে। তাই অধ্যাপক টনি যথার্থই বলেছেন, "সাম্য স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতাকে কল্পনা করা যায় না।"

সমতা একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয়। কারণ এটি অধিকার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সম্পত্তি এবং ন্যায়পরতার ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমতা অর্থ সকল ব্যক্তির প্রতি সমান আচরণ করা।

সমতা

সমতা একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয়। কারণ এটি অধিকার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সম্পত্তি এবং ন্যায়পরতার ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমতা অর্থ সকল ব্যক্তির প্রতি সমান আচরণ করা। এটি একটি সমাজে বা পরিস্থিতিতে সব মানুষকে একই সুযোগ, অধিকার এবং প্রাপ্তির অধিকারী করা। সমতার মূল উদ্দেশ্য হলো, কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য না রেখে, সবাইকে এক রকম সুযোগ বা অধিকার দেওয়া। সমতার মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একই আইন এবং নিয়ম প্রযোজ্য হয়। অন্য ভাষায় সমতা বলতে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং বৈষম্যের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করাকে বোঝায়। সমতার নানা প্রকার রয়েছে। যেমন: প্রাকৃতিক সমতা, সামাজিক সমতা, অর্থনৈতিক সমতা, রাজনৈতিক সমতা, সাংস্কৃতিক সমতা, আইনগত সমতা এবং আন্তর্জাতিক সমতা ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সমতা অর্থ সমাজের সকল ব্যক্তির মর্যাদা, অধিকার এবং সুযোগের ক্ষেত্রে সমান হওয়া, অর্থাৎ তাদের পরিস্থিতি নির্বিশেষে একই সম্পদ ও সুযোগ পাওয়া। সমতার মার্ক্সীয় ধারণা সমতার উদারনৈতিক মতবাদের বিরোধিতা করে। মার্ক্সীয় ভাবনানুসারে সমতার ধারণার দুটি দিক রয়েছে। যথা: সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের সাম্যবাদী পর্যায়ে মানবকেন্দ্রিক। মার্ক্সীয় দর্শন পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থনৈতিক সমতা বলতে একটি শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজকে বোঝায়। আবার সমতার একটি মানবকেন্দ্রিক রূপও থাকবে, যখন সমাজতন্ত্রের সর্বশেষ পর্যায় রাষ্ট্রের বিলুপ্তির ঘোষণা দিবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে শ্রেণিবিরোধিতা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সমবায় একটি সংগঠন যেখানে মানুষজন নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। এটি এমন একটি সংগঠন যেখানে সদস্যবৃন্দ অর্থনৈতিক সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভাগ করে নেয়, যা সাম্য ও সততার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমবায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে এবং এর সদস্যরা এই লক্ষ্য অর্জনে সমান সুযোগ ও অধিকার পায়, যা সমাজের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সংগত ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটায়। এই ধরনের সংগঠন সদস্যের সততা ও একে অপরের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, যা একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ তৈরিতে সাহায্য করে। মূলত সাম্য ও

সমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, উন্নত এবং বৈষম্যহীন দেশ বা জাতি গঠন সম্ভব।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাম্য ও সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার। এ প্রসঙ্গে বরেণ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম স্বপ্ন ছিল সমতাভিত্তিক সমাজ (Egalitarian society) বিনির্মাণ। কিন্তু সেই লক্ষ্য থেকে দেশ আজ যোজন যোজন দূরে। একাত্তরের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য তিনটি মূলস্তম্ভ অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য...।' এছাড়া ন্যায্য, সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের অঙ্গীকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।' আবার ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

১. শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না। এবং
২. রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। অথচ বাস্তবে বৈষম্য দূর করে, সমান কর্মসংস্থানের সুযোগের ধারণাটি বাংলাদেশে সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় না।

এছাড়া জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) ১০ নম্বর অভীষ্টে অসমতা কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। ১০ নম্বর অভীষ্টের আওতায় ১৩টি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে; যার অন্যতম হলো আয় অসমতা, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, সমান সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্য বিলোপ ও সমতা অর্জনের জন্য নীতিকাঠামো প্রণয়ন।

সাধারণত সমতা বলতে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা দুরূহ। আবার সমতা বলতে মার্কস সমাজের শ্রেণিবিভাগের বিলুপ্তির কথা বলেছেন। সাম্য ও সমতা সমাজে সকল মানুষের সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করা। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ই স্টিগলিৎজ তাঁর The Great Divide গ্রন্থে অসমতাকে সমাজে বিভক্তির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, অসমতাকে একটি চয়েস (বাছাই) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ অসমতার নীতি রাষ্ট্রপরিচালনায় নিয়ামক হয়ে উঠছে (খান, ২০২৩)। নীতিনির্ধারকেরা সমতার কথা বলছেন, কিন্তু অসমতা কমিয়ে আনতে প্রণীত নীতিকাঠামোর অকার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে। এদিকে ভারতীয় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একটি নৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন, "আমার ধনী হওয়ার কী অধিকার রয়েছে? সমৃদ্ধ জীবনযাপনের কী অধিকার রয়েছে? যেখানে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ রয়েছে দারিদ্র্য ও অসমতার মধ্যে।" হুগো বেডো বলেন যে, "সমতাবাদী হিসেবে চিন্তা করার অর্থই হলো মানুষের মধ্যে সকল অসমতার পরিসর ও পর্যায়কে বিবেচনা করা এবং এগুলোকে দূর করা কিংবা অন্ততঃপক্ষে হ্রাস করার জন্য উপায় আবিষ্কার করা।"

রাষ্ট্রকে একটি সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করা মানবিক মর্যাদার অন্যতম দিক। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (২)-এ ঘোষণা করা হয় : 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ফলাফলের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে না পারায় একটি সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক নাগরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি (ফারুক, ২০২৫)।

উপসংহার

সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং যেকোনো ধরনের বৈষম্যের বিলোপ সাধন সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি। সমতাভিত্তিক নাগরিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে প্রয়োজন নতুন ও বৈচিত্র্যময় সৃজনশীল চিন্তা, নীতি ও আইনের সমন্বয় এবং দূরদর্শী রাজনীতি ও সঠিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গড়তে অসমতা দূর করা দরকার। দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া সম্পদ ও আয়কেন্দ্রিক অসমতা কমানো সম্ভব নয়। বৈষম্যহীন মূল্যবোধ প্রচারের জন্য গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা উচিত। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা নির্ভর সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ করতে হলে অসমতা দূর করতেই হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাম্য ও সমতা। এভাবেই সমবায় উদ্যোগে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন এবং উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

- অধিকারী, মহেন্দ্রনাথ, সমাজদর্শনের কয়েকপাতা, রাজশাহী: ইমপিরিয়্যাল বুকস, অক্টোবর, ১৯৯৫
- আহসান, নাজমুল, শিক্ষায় ন্যায্যতা ও সমতা যে কারণে জরুরি, দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৩
- খান, মো: রবিউল আলম, সমতার সমাজ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি, দৈনিক প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩
- ফারুক, মুহাম্মদ ওমর, সমতা নাকি ন্যায়বিচার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ, ২০২৫
- পারভীন, রেহেনা, সমতার স্বরূপ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ভলি. ৮, নং ১, জানুয়ারি-জুন, ২০২৮
- মকসুদ, সৈয়দ আবুল, সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার, দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মার্চ, ২০১৫
- রায়হান, জহির, সাম্য ও মানবিক মর্যাদার স্বপ্ন কত দূরে, দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল, ২০১৯

■ খ. ম. রেজাউল করিম, পিএইচডি : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সমাজবিজ্ঞান, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর-৭৪০০।

মিতব্যয়ী মানুষেরা গরিব হয় না

এমদাদ হোসেন মালেক

ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক ফ্রেডরিখ উইলহেলম রাফাইসেন এখন থেকে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে বলেছেন, দারিদ্র্য থেকে হঠাৎ পরিত্রাণের কোনো জাদুবিদ্যা নেই। তিনি আরও বলেছেন, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে চাইলে পরিকল্পিত সঞ্চয়ের বিকল্প নেই।

পরিকল্পিত সঞ্চয়ের ব্যাপারে নানামত মুনির নানা মত থাকতে পারে, তারপরও আমরা সমবায়ীরা বলে থাকি যে যত গরিব তার তত বেশি মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হতে হবে।

ধনী ও সম্পদশালীদের কেউ কেউ বেখেয়ালে সঞ্চয়ী না হলে চলে যেতে পারবেন। কারণ, কোনো ধনী ব্যক্তি বিপদে পড়লে তার বন্ধু, আত্মীয়স্বজন ও ধনীজনেরা তার সহায়তায় এগিয়ে আসবেন। কিন্তু গরিব লোকেরা বিপদে পড়লে যারা এগিয়ে আসবেন, তাদের অনেকের পক্ষে অর্থের অঙ্কে সহায়তা করার সামর্থ্য নেই।

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বিপদের অপর নাম অর্থ। যার নেই অর্থ, তার নেই কোনো গন্তব্য। মূলত এ বিচারে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাপনায় যার টাকাকড়ি নেই তার কিছুই নেই। গরিব মানুষদের অর্থব্যবস্থাপনায় যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন তা হলো তার বর্তমান আয়ের কমপক্ষে ২০/১ অংশ ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য অবশ্য অবশ্যই সঞ্চয় করতে হবে। কারণ, বর্তমান অবস্থার চেয়ে আগামীর দিনগুলো ক্রমান্বয়ে জটিল ও দুরূহ হচ্ছে। আগামীর সমস্যায় আজকের মতো শরীর খাটিয়ে টিকে থাকা আদৌ সম্ভব হবে এটা কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে

আজকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ভবিষ্যতের অবলম্বন। আজকের অর্থ সংকট যা আছে; আগামীতে তার লাঘব চাইলে অবশ্য অবশ্যই প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্তে খরচ কমিয়ে মিতব্যয়ের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হতে হবে।

না। তাই ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আর এ প্রস্তুতি হচ্ছে প্রাত্যহিক আয়ের একাংশ পরিকল্পিতভাবে সঞ্চয় করা। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের বিকল্প নেই। আর তাই বলা হয় সঞ্চয় করার পূর্বপ্রস্তুতি হচ্ছে মিতব্যয়ী হওয়া।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম বা মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করাই মিতব্যয়। শৃঙ্খলাপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মধ্যম পন্থা অনুসরণ করাই ইসলামের নির্দেশ। অপচয় ও অপব্যয় মানুষের মন্দ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। অপচয় হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা। সুতরাং অপচয় ও অপব্যয় না করে তা মানব কল্যাণে যথাসাধ্য ব্যয় করাই হচ্ছে প্রকৃত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকারী মানুষের কাজ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করা হয়েছে– 'আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন তারা অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তারা আছে এ দুইয়ের মধ্যে মধ্যম পন্থায় (সুরা আল্-ফুরকান : আয়াত-৬৭)। অপরিমিত ব্যয় ক্ষতি ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না; বরং বাহুল্য ব্যয় সাধারণত গর্ব অহংকার আত্মপ্রচারে এক ধরনের অনৈতিক ত্রুটি। অপচয়কারী দোষী এ কারণে যে তারা নিজের অপ্রয়োজনে ব্যয় করছে; অথচ নিঃস্ব ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজনে সহায়তা করছে না। মানুষ তখন মানুষ হয় যখন সে অন্য মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি দেখায়। বিপদে-আপদে সহায়তা করে। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হে আদম সন্তান তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অভাবী বান্দাদের দারিদ্র্য বিমোচন ও দ্বীন ইসলামের কাজে খরচ করো, তাহলে এটি হবে তোমার জন্য উত্তম (তিরমিজি)। ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। মহানবী (সা.) বাণী প্রদান করেছেন 'যে ব্যক্তি মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি বাহুল্য খরচ করবে আল্লাহ্ তাকে গরিব বানিয়ে দেবেন।'

ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক কথাবার্তার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে সঞ্চয় করতে চায় তাহলে কিছু অভ্যাস বা ইচ্ছা ত্যাগ করার জন্য কঠিন অনুশীলন করতে হবে। এ কথা আমরা সবাই জানি ক্ষুদ্র সঞ্চয় বৃহৎ পুঁজির ভিত্তি রচনা করে।

আজকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ভবিষ্যতের অবলম্বন। আজকের অর্থ সংকট যা আছে; আগামীতে তার লাঘব চাইলে অবশ্য অবশ্যই প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্তে খরচ কমিয়ে মিতব্যয়ের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হতে হবে।

মিতব্যয়ী ও সঞ্চয় এমন একটি পন্থা যার অভ্যাস ও চর্চা লালন করতে নিজ ইচ্ছা ও অনুশীলনই যথেষ্ট। এ কাজে কারও পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার প্রয়োজন খুব একটা পড়ে না। যে ব্যক্তি দিনে পাঁচ কাপ চা এবং পান বিড়ি সিগারেট ফুঁকে ৫০ টাকা ব্যয় করেন, সে ব্যক্তি সংকল্প করে পাঁচ কাপ চায়ের পরিবর্তে ২ কাপ খাবেন এবং পান-বিড়ি ২০ টাকার খরচ ৫ টাকায় নামিয়ে আনবেন, তাহলে প্রতিদিন এ দুই অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে তিনি ৩০ টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন। দিনে ৩০ টাকা সঞ্চয় হলে ৩৬৫ দিনে সঞ্চয় হবে (৩০X৩৬৫)= ১০,৯৫০ টাকা। এক বছরে ১০,৯৫০ টাকা সঞ্চয় হলে এ হিসেবে দশ বছরে সঞ্চিত পুঁজি দাঁড়াবে ১,০৯,৫০০ টাকায়। তাই বলা হয় অপব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় করতে সংকল্প ছাড়া কোনো বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে না। সঞ্চয়ের মাধ্যমে লাখপতি হওয়াও দুরূহ নয়। ইচ্ছা এবং মনোবল এ কাজে প্রধান ও প্রথম অবলম্বন। আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার আমার যা কিছু আয় হচ্ছে তা থেকেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নয়নকল্পে খরচ কমিয়ে সঞ্চয় করা এবং একই সাথে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে ঋণ গ্রহণ ও সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হওয়া এবং যথাসাধ্য সম্পদ অর্জনে মনোনিবেশ করার বিকল্প পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় যে যত সম্পদ বা অর্থের মালিক, সে ততবেশি সম্মানী ও ক্ষমতাধর। এ প্রসঙ্গে ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক ফ্রেডরিক উইলহেলম রাফাইসেন বলেছেন 'আর্থিকভাবে শক্তিশালী নয়, সুখী শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনই অর্থ উপার্জনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।' তিনি আরও বলেছেন, নিজ উদ্যোগ ও পরিশ্রম ব্যতীত আর্থিক অভাব-অনটন, ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষ কোনো জাদুবিদ্যা দিয়ে হঠাৎ দূর করা যায় না।

ক্রেডিট ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত আমরা সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি -কঠোর পরিশ্রম ও মিতব্যয়ের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জীবনে অর্থ সংকট থাকবে না। কখনও সংকট হবে না। তারা নিঃস্ব গরিব হয় না, হবেও না।

মিতব্যয়ীরা যে গরিব হয় না এ কথা শুধু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমাদের নয়; এ কথা ধর্মের ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের।

■ এমদাদ হোসেন মালেক : প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

সমবায়ের ছোঁয়ায় তৃণমূল মানুষের সমৃদ্ধি

রাফায়েল পালমা

অভিবাসন মানুষের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সংগত কারণেই মানুষ স্থান পরিবর্তন করে থাকে। অনেক অনিশ্চয়তা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সাফল্য-বিফলতার দুশ্চিন্তার দোলাচলেই অভিবাসনের ঘটনা ঘটে। অভিবাসী হওয়ার পিছনে ভাওয়ালের খ্রিস্টভক্তদের আশার আলো ছিল উত্তরবঙ্গে কিছু ইউরোপীয় খ্রিস্টান পাদ্রীর উপস্থিতি। শতবর্ষ পূর্বে ওই পাবনা-নাটোরের বনপাড়া, বোর্ণী, মথুরাপুর অঞ্চল ছিল নানা সংকট ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তৎকালে ওই নাটোর-পাবনা অঞ্চলে মানুষের সংখ্যা ছিল কম, জমির মূল্যও ছিল কম, প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল পর্যাপ্ত। পরিশ্রম ছাড়া বা সামান্য পরিশ্রমে নিরিবিলি সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য ছিল প্রচুর সুযোগ-সুবিধা।

একশ বছর পূর্বে গাজীপুরের ভাওয়াল অঞ্চল থেকে হাতেগোনা কিছু খ্রিস্টান পরিবার তৎকালীন রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার অন্তর্গত জোনাইল ইউনিয়নে ভাগ্যান্বেষণে বসতি স্থাপন করে।

এসব এলাকার জমিতে উর্বরতা শক্তি ছিল অনেক। স্বল্প শ্রম, আবাদি জমি, গভীর অরণ্য, মজা জলাশয়, দেশি আমের প্রাচুর্য, রকমারি সবজি, মাছের সহজলভ্যতা, বানের পানি ও নানা ফুল-ফলের বাহারে ভরপুর ছিল এসব অঞ্চল। প্রকৃতিই যেন মানুষের অভিবাসনকে টানে। উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও আরো নানা কারণেই উত্তরবঙ্গ ছিল প্রসিদ্ধ। বন্যপ্রাণী শিকারের জন্যও গাজীপুরের ভাওয়ালের অনেকে ওইসব স্থানে গমনাগমন করেছেন।

অন্যদিকে, ভাওয়াল অঞ্চল ছিল ভিটাসর্বস্ব জনপদ। এক ভিটাতেই বাস করতে হতো অনেক প্রজন্মকে। ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ বেল্লার বিলে একাধিক বছর

পিছিয়ে-পড়া পাড়াগাঁয়ে, নিভৃত পল্লিতে গড়ে তোলেন একটি সুগঠিত জনপদ; বোর্ণী ধর্মপল্লি; বোর্ণী কাথলিক চার্চ। অশিক্ষা-কুশিক্ষার একটি অঞ্চলে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সকল কাজ করতে শুরু করলেন ফাদার।

অতিবন্যার কারণে ফসলহানি মানুষকে হতাশ ও নিরাশ করেছিল। অভাব-অনটনে লংগরখানার খাবার খেয়ে তাদের জীবনাতিপাত করতে হয়েছে। এসব নানা বৈষয়িক কারণে ভাওয়ালের খ্রিস্টান পরিবারগুলোর একটি বিরাট অংশ পাবনা-নাটোরের ওইসব স্থানে অভিবাসনে চলে যান। নাটোর ও পাবনার মথুরাপুর, বোর্ণী ও বনপাড়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে।

বাঘ, শিয়াল, বনবিড়াল, শুকরসহ আরো অনেক বন্যপ্রাণীর অত্যাচার তাদের বয়ে বেড়াতে হয়েছে দীর্ঘ সময়কাল ধরে। কিন্তু উর্বর জমির কারণে ধান, সবজি, মাছ, গবাদিপশু পালন, নানা ফলফলাদির প্রাচুর্যে তারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এসবের আকর্ষণই ভাওয়ালবাসীর, বিশেষ করে ভাওয়ালের কালিগঞ্জ অঞ্চলের খ্রিস্টভক্তগণের অভিবাসনের কারণ।

নাটোর-পাবনার এসব অঞ্চলে গিয়ে তাদের চ্যালেঞ্জও কোনো অংশে কম ছিল না। নতুন এলাকায় খ্রিস্টানদের আগমন ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির জন্য তাদের স্থানীয়ভাবে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ভাওয়াল থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ হাল ছাড়েননি। তারা ওই অঞ্চলের ইউরোপীয় মিশনারিদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে একতাবদ্ধ থেকেছেন। যেকোনো যৌথ সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও প্রয়োজন বলে মনে করেছেন এবং একসাথে কাধে কাধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

নাটোরের জোনাইল ইউনিয়নের অধীন বোর্ণী ক্যাথলিক মিশনের তৎকালে পরপর কয়েকজন ইতালিয়ান পাদ্রী মিশন কাজ চালিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ফাদার লুইজি ওজ্জনি, ফাদার লুইজি বেগুনি ও ফাদার এঞ্জোলো কান্তন। ইতালিয়ান পাদ্রীদের সংঘকে, সম্প্রদায়কে বা সমাজকে বলা হয় পিমে। সেই সম্প্রদায়ের পাদ্রীগণ ইতালি থেকে তৎকালে জলজাহাজে করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মিশন কাজে আগমন করতেন তাদের প্রৈরিতিক-সেবাকাজ করার জন্য।

ইতালিয়ান পাদ্রী ফাদার এ. কান্তন পাদ্রী হিসেবে দিক্ষিত হবার পরপরই যুবক ফাদার হিসেবে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর ভারতবর্ষে রওনা হন। মোট ১৩ দিন সাগর যাত্রার পর ১২ নভেম্বর বোম্বে এসে পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনদিন ট্রেন যাত্রা করে কোলকাতায় পৌঁছে। তৎকালীন কোলকাতার জরাজীর্ণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুহূর্তেই আবার নিজ দেশ ইতালিতে ফিরে মনস্থির করলেন। কারণ, এতো দৈন্যদশা-বেহাল অবস্থায় তার মন খুবই খারাপ হয়ে যায়। অবশেষে এই যুবক ফাদার (পাদ্রী) সবকিছুকে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা হিসেবে মেনে নিয়ে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার আন্ধারকোটা কাথলিক চার্চে আসেন। সেখান থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৫ নভেম্বর ট্রেনে করে পাবনার চাটমোহর স্টেশনে আসেন। ট্রেন থেকে নেমে দেখেন নাটোর মহকুমার জোনাইল ইউনিয়নের বোর্ণী কাথলিক চার্চের স্কুলের একজন কেরানি গরুর গাড়ি নিয়ে বসে আছেন। গরুর গাড়ির ধীরগতির দীর্ঘ সময় যাত্রার পর বোর্ণী মিশন পৌঁছতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। বোর্ণীতে ভাওয়াল থেকে আগত কিছু অভিবাসী খ্রিস্টভক্ত ফাদারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তারা ব্যান্ডের বাজনা বাজিয়ে ফাদারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে যার যার মতো নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। ফাদারের জন্য ছিল একখানা ছনের ঘর, তার পাশে একটি গোয়ালঘর।

সবাই চলে যাবার পর যুবক ফাদার একেবারেই একা হয়ে পড়লেন। কারণ, সেখানে অন্য কোনো ফাদার বা সিস্টারদের বাড়ি ছিল না। নিঃস্তব্ধ পরিবেশে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি, হারিকেনের আলোতে দেখতে পান কতগুলো ইটের ওপর চটের বস্তা দিয়ে একটি বিছানা তৈরি। তিনি আর কান্না থামাতে পারছেন না। তিনি বলেন ‘বেশ কিছুক্ষণ একা একা কাঁদলাম। এভাবে শুরু হলো আমার প্রথম রাত্রি।’

সমবায় আরো কয়েকজন ইতালিয়ান ফাদার বোর্ণী অঞ্চলে মিশনারি কাজ করলেও শক্তহাতে হাল ধরলেন ফাদার এ. কান্তন। আস্তে আস্তে অভিবাসী মানুষের সাথে পরিচিত হলেন। মানুষকে সংগঠিত করলেন। তার বদান্যতায় ভাওয়াল থেকে আগত অভিবাসীরা বোর্ণীতে একতাবদ্ধ হন। ধীরে ধীরে সমবায়ের ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে।

পিছিয়ে-পড়া পাড়াগাঁয়ে, নিভৃত পল্লিতে গড়ে তোলেন একটি সুগঠিত জনপদ; বোর্ণী ধর্মপল্লি; বোর্ণী কাথলিক চার্চ। অশিক্ষা-কুশিক্ষার একটি অঞ্চলে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সকল কাজ করতে শুরু করলেন ফাদার।

তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ খ্রিস্টানদের অতি নিম্নবর্ণের সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করতেন। হাটেবাজারে চলাফেরা, নৌকায় ওঠা, স্থানীয় রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরায় খ্রিস্টানদের অনেক বিধিনিষেধ ছিল। ইচ্ছে করলেই কোনো খ্রিস্টভক্ত কোনো রেস্টুরেন্টে পানি বা খাবার খেতে পারতো না। বর্তমানে সকল ধর্মের লোকেরা একসাথে মিলেমিশে বৃহত্তর সমাজ হিসেবে চলাফেরা করছে। বোর্ণী অঞ্চলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের এ এক অভূতপূর্ব মেলনবন্ধন দৃশ্যমান।

ফাদার এ. কান্তন জঙ্গল পরিষ্কার করে প্রত্যন্ত নিভৃত পল্লিতে গড়ে তুললেন এক আলোক ঝলমলে নগরের আদলে এক চমৎকার সুন্দর জনপদ। কোনো এক অজ্ঞাত শহরের মেয়রের দায়িত্ব যেন

বোর্ণী কাথলিক চার্চের ১০ একরের ইটের ওয়ালঘেরা চত্বরে রয়েছে ওই নানা অবকাঠামোর সমাবেশ। রয়েছে নারিকেল গাছসহ আরো নানা ফুল ও ফলের গাছে ঘেরা এক নান্দনিকতা। যেকোনো মানুষের মন ভালো হওয়ার এক অনিন্দ আধ্যাত্মিক ও আমোদিত পরিবেশ।

তিনি হাতে তুলে নিলেন। রাস্তাঘাট, নানা অবকাঠামো নির্মাণ করতে শুরু করলেন তার নিজ দেশের আর্থিক সহায়তায়।

কর্মচাঞ্চলের এক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো বোর্ণী পল্লি। রীতিমতো বোর্ণী পরিণত হলো একটি নান্দনিক কমপ্লেক্সে। গড়ে উঠল ২০০০ মানুষের ধারণ ক্ষমতার একটি গির্জাঘর, জাতি-ধর্ম-বর্ণের শিক্ষার জন্য গড়ে তুলেন প্রাইমারি ও হাইস্কুল। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছেলে মেয়েরা যেন থেকে খেয়ে রাত্রি যাপন করে লেখাপড়া করতে পারে এজন্য তিনি ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা হোস্টেল, সকল সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যসেবার ডিসপেনসারি, সেলাই সেন্টার, ফাদারের আবাসিক ভবন, সিস্টারদের আবাসিক স্থাপনা, খেলার মাঠ, ইত্যাদি নির্মাণ করলেন।

বোর্ণী কাথলিক চার্চের ১০ একরের ইটের ওয়ালঘেরা চত্বরে রয়েছে ওই নানা অবকাঠামোর সমাবেশ। রয়েছে নারিকেল গাছসহ আরো নানা ফুল ও ফলের গাছে ঘেরা এক নান্দনিকতা। যেকোনো মানুষের মন ভালো হওয়ার এক অনিন্দ আধ্যাত্মিক ও আমোদিত পরিবেশ।

সমবায়ের উৎপত্তি

এ এলাকার সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ফাদারের উৎসাহে গড়ে তোলা সমবায় প্রতিষ্ঠান। নাম জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত অভিবাসী খ্রিস্টভক্তদের সম্পৃক্ত করে একসাথে সমবায়ের আদলে সকল কিছু সম্পন্ন করা হয়।

বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক ফাদার চার্লস জে. ইয়াংয়ের সহায়তায় ফাদার এ. কান্তন কিছু অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত অভিবাসী খ্রিস্টভক্ত মানুষ নিয়ে বোর্ণীতে গড়ে তুলেন জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড।

ফাদার এ. কান্তনের নেতৃত্বে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হলো জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। তৎকালে মানুষের সংখ্যা কম থাকাতে স্বল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে এই সমবায় গঠিত হলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৩ হাজার ৮১৯ জন। কিন্তু নানা প্রডাক্টের সদস্য হওয়াতে সর্বসাকুল্যে সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ হাজার।

সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কারণে ছোট ছোট অঙ্কের অর্থ জমানোর ফলে সমিতির সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমাণ ২০২৫-এর জুন নাগাদ ৪৪ কোটি ৩৯ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। মুরগির ডিম, গাভির দুধ, বাগানের সবজি, গাছের ফল বিক্রি করে এবং কিছু চাকুরের ছোট ছোট আয়ের ফলস্বরূপ জমে উঠেছে এই মূলধন।

বোর্ণী মিশনারি অবকাঠামোতে বর্তমানে এই সমিতির কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অতি শীঘ্রই সমিতির নিজস্ব প্লটে একাধিক তলার ইমারত তৈরি করার কার্যক্রম চলছে।

সমিতির পরিচিতি

বর্তমানে বোর্ণী চার্চের অধীন পরিচালিত সমবায়ের ৩০-৩৫ জন পরামর্শক রয়েছে। পদাধিকার বলে এর প্রধান পরামর্শক হলেন চার্চের পরিচালক আদিবাসী ফাদার আন্তনী হাঁসদা। অন্যান্য পরামর্শকগণ হলেন এলাকার সকল পর্যায় থেকে যেমন শিক্ষক, চাকুরে, কৃষক ও নানা পেশার লোকজন। এতে সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্ব সমুন্নত রাখা সম্ভব হয়েছে।

পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারি, একজন ম্যানেজার ও একজন ট্রেজারার ছাড়াও ছয়জন পরিচালক, পাঁচজনের একটি ঋণদান কমিটি ও তিনজনের একটি পর্যবেক্ষক কমিটি। এদের সবাই বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, যেমন এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, কৃষক, গৃহিণীসহ অন্যান্য পেশাজীবী। পরিষদে সাতজন নারীকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মোট ১৯ জন অফিস কর্মচারী রয়েছে, যাদের অক্লান্ত শ্রমে সমিতি সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে।

অতি তাড়াতাড়ি প্রধান সড়কের ধারঘেঁষে সমিতির নিজস্ব জমিতে একাধিক তলাবিশিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

সমিতির ম্যানেজার ফ্রান্সিস সুনীল পালমা জানান, প্রতি মাসে কমবেশ ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে সাধারণ সদস্যের মধ্যে প্রদান করা হয়।

'ছাত্র প্রকল্পে' প্রতি বছর ছয়জন শিক্ষার্থী নিয়োগ দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। প্রতি শিক্ষার্থী মাসে কমপক্ষে ১৫ দিন কাজ করে থাকে। প্রতিদিন তিন ঘণ্টা কাজ অনিবার্য। বর্তমানে পাঁচজন মেয়ে ও একজন ছেলে শিক্ষার্থী কর্মরত রয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ৫০-৬০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়, যেন তারা

অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড শক্তিশালী হবার কারণে বোর্ণী কাথলিক চার্চের অধীন গ্রামগুলোর ঘরবাড়ির চেহারার বদল হয়েছে। ছনের ঘরের স্থানে সেমিপাকা বিল্ডিং বা ছাদসহ বিল্ডিং দৃশ্যমান। রাস্তাঘাটের যোগাযোগের উন্নতি হচ্ছে, মানুষের মনের সংকীর্ণতার স্থলে প্রসারতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কমপক্ষে ছয় মাসের স্কুলের বেতন দিতে সক্ষম হয়।

কথা হয় উচ্চমাধ্যমিকের মেয়ে শিক্ষার্থী রুদ্রা গমেজের সাথে। এই মেয়ে শিক্ষার্থী জোনাইল ডিগ্রি কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়াশোনা করছে। তিনি জানান, ছাত্র প্রকল্পে কাজ করে মাসে সে ২০০০ টাকা পায়। কাজ করে লেখাপড়া করা যে আত্মতৃপ্তি তা তার ভালো লাগে। এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে ভালো ফল বয়ে আনবে বলে তিনি মনে করেন।

ঋণ কমিটির মাধ্যমে সকল প্রকার ঋণ অনুমোদন হয়ে থাকে। যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে ঋণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেন কোনোভাবেই ঋণের অর্থ অন্য কোনো খাতে ব্যবহৃত না হয়। ফলে ঋণ ফেরতের ক্ষেত্রে অনিয়ম খুবই কম। সমিতির পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং করার কারণে নিয়মিত ঋণ ফেরতের বিষয়টি ত্বরান্বিত হয়ে আসছে। ফলে ডিফল্টারের পরিমাণ সমিতির আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে, জানান সমিতির ম্যানেজার।

চয়ন রোজারিও একজন ভ্যারাইটিজ স্টোরের মালিক। তিনি ব্যবসার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এই দোকান পরিচালনা করছেন। তিনি জোনাইল ইউনিয়ন হাটে দোকান ভাড়া নিয়ে চাল, ডাল, তেল, নুনসহ নানা প্রসাধনী ও গৃহস্থালি দ্রব্যাদি বিক্রি করছেন। কয়েকজন যুবক কর্মী নিয়ে সপ্তাহে সাতদিনই রাতে ঘুমের সময় ব্যতিরেকে মনোযোগ দিয়ে তিনি এই ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

চয়ন কিছুটা নিয়ম ভেঙে হলেও নিয়মিত ঋণ ফেরতদাতা। তার স্বপ্ন পূর্ণ সচ্ছল ও মর্যাদাপূর্ণ এক জীবনযাপন; প্রজন্মকে আরো উন্নত জীবনে নিয়ে যাওয়া। তার মতো ঋণ নিয়েছেন পবিত্র রোজারিও, স্বপন অ্যান্থনীসহ আরো অনেকে।

সমিতির কর্মব্যাপ্তি

বোর্ণী কাথলিক চার্চে মোট গ্রামের সংখ্যা ১৫টি এবং খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা সাড়ে ৬ হাজার। প্রতিটি গ্রামে রয়েছেন মিশনভিত্তিক একজন প্রতিনিধি যিনি প্রতিনিয়ত মিশনের ফাদারের সাথে সংযোগ রেখে চলেন। বর্তমানে নানা কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ ব্যবস্থাপনা, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নিয়ে নিয়মিত চার্চের সাথে ও সমিতির সাহায্যে সার্বিক জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করার তাগিদ অব্যাহত রয়েছে। বোর্ণী মিশনের অধিবাসী কিন্তু চাকরির সুবাদে প্রবাসী হয়েও সদস্য হিসেবে সমিতির সাথে ওতপ্রতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন ও সক্রিয় সহযোগিতা করে চলেছেন।

সমিতির প্রভাব

সমিতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে মোটাদাগে কর্মএলাকার সকল মানুষ আর্থিকভাবে সচ্ছল। বলা যায়, অত্র অঞ্চলের শতভাগ শিশু স্কুলে যায়। সমিতির কর্মএলাকায় নিরক্ষর যারা দু-একজন আছেন, তারা এই সমিতি শুরুর আগের বৃদ্ধ মানুষ।

উচ্চশিক্ষার হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থী উন্নত দেশে যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, আমেরিকাসহ আরো অন্য দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়েছেন। কয়েকটি পরিবার আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় নিজস্ব আবাসিক ব্যবস্থা করে সেসব দেশে চাকরিসহ বসবাস করছেন। দেশে অর্থ পাঠাচ্ছেন, তাতে সার্বিকভাবে নিজস্ব অঞ্চলের উন্নতি চলমান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে সার্বিক উন্নয়ন।

অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড শক্তিশালী হবার কারণে বোর্ণী কাথলিক চার্চের অধীন গ্রামগুলোর ঘরবাড়ির চেহারার বদল হয়েছে। ছনের ঘরের স্থানে সেমিপাকা বিল্ডিং বা ছাদসহ বিল্ডিং দৃশ্যমান। রাস্তাঘাটের যোগাযোগের উন্নতি হচ্ছে, মানুষের মনের সংকীর্ণতার স্থলে প্রসারতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শতবর্ষ পূর্বে অশিক্ষিত, নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত ভাওয়ালবাসী অভিবাসী হয়ে অত্র অঞ্চলে এলেও তাদের প্রজন্ম বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, দেশে ও বিদেশের মাটিতে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রজন্মের মধ্যে এক বিরাট অভিনব ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান।

শেষ কথা

হতদরিদ্র মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ, ২১ বছর নিবেদিতপ্রাণ ইতালিয়ান পাদ্রী ফাদার এ. কান্তন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে জাতি-ধর্ম-বর্ণের মধ্যে যে উন্নয়নের আলো জেলেছেন, তার কারণে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের একটি ছোট্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনমানের যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

টেকসই উন্নয়নের জন্য সমবায় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির কোনো বিকল্প নাই। বাংলাকে যদি সমন্বিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায়ের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা আবশ্যকীয়। তবেই গঠিত হতে পারে সমন্বিত উন্নত মুক্ত-স্বাধীন সমাজ।

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

যুগোপযোগীকরণ প্রস্তাব

মোঃ মোখলেছুর রহমান

দেশের সাধারণ মানুষের বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সমবায় প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের পর 'বার্ষিক নিরীক্ষা' ব্যতীত এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমবায় বিভাগের যোগাযোগ-সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। সমবায়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সমবায়-জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত দক্ষতা সৃজন ও আয় বৃদ্ধি, সরকারি নীতি-নির্দেশনা পৌঁছানো ও বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে মাঠ পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Non-Institutional Training) যা সমবায় বিভাগে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ নামে সমধিক পরিচিত অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কারো কোনো সংশয় নাই। কিন্তু বিদ্যমান মডিউল ও সিডিউলে এ প্রশিক্ষণ কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে সে বিষয়ে সকলেরই প্রশ্ন রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়কে আরো কার্যকর করার সময় এসেছে, এটি সংস্কার করে আরো যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। নিম্নে এর সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরা হলো।

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ (Non-Institutional Training)

বিদ্যমান ব্যবস্থা

প্রতিটি উপজেলায় ৩টি (কম-বেশি) কোর্সের জন্য টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রতিটি কোর্সের জন্য ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা অনুমোদন করা হয়। এ অনুমোদনে খাতভিত্তিক অর্থ বিভাজন (প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা-৫০০

টাকা জনপ্রতি, মোট প্রশিক্ষণার্থী-২৫ জন, প্রশিক্ষকের সম্মানী-১০০০ টাকা প্রতি সেশন, মোট সেশন ৫টি, মোট বরাদ্দ ৫,০০০ টাকা প্রতি কোর্স, কোর্স পরিচালকের সম্মানী-৮০০ টাকা, সহকারী পরিচালক-৭০০ টাকা, নাস্তাসহ দুপুরে খাবার-৩৪০ টাকা জনপ্রতি, খাতা-কলম-ফোল্ডার-৬০ টাকা জনপ্রতি, অন্যান্য খরচ-১০০০ টাকা), প্রশিক্ষক সংক্রান্ত নির্দেশনা (সমবায় সংক্রান্ত ৩ জন এবং স্থানীয় চাহিদামাফিক ২ জন বক্তা সেশন নিবেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বা সমবায়ী অতিথি থাকবেন), কোর্স সংক্রান্ত নির্দেশনা (২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ১ দিনের কোর্স, সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত) প্রদান করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

সাধারণত উপজেলা পরিষদের হলরুমে প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। অনেক সময়ে সুবিধাজনক কোনো সমবায় প্রতিষ্ঠানে বা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমেও হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমবায় থেকে ১-৫ জন করে সমবায়ী গ্রাম-এলাকা দূরদূরান্ত থেকে আসে। সকাল ৯ টায় প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য কারণে সম্ভব হয় না। তবে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল প্রশিক্ষণে সমবায় সংক্রান্ত সমবায় কি ও কেন, হিসাব বিবরণী প্রস্তুত ও অডিটে হিসাব উপস্থাপন, রেকর্ড সংরক্ষণ ও হিসাব প্রস্তুতকরণ, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, নিরীক্ষা কি ও এর প্রয়োজনীয়তা, বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি ও আধুনিক কৃষি, মৎস্যচাষ, আম চাষ, গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ, সরকারি সমসাময়িক বিষয় হিসেবে যৌতুক, মাদকদ্রব্য ও বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আবশ্যিকভাবে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিকে যুক্ত করা হয়েছে। সারাদেশে যতগুলো ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ হয়েছে তার প্রায় সকল প্রশিক্ষণে প্রশাসনের সেশন রয়েছে। এক দিকে যেমন ৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা সহজ হয় না,

সমবায় প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী, সমবায়ীদেরকে দক্ষ-অভিজ্ঞ ও সচেতন, সমবায়ের ব্যবসা ও উদ্যোগকে লাভজনক করা গেলেই কেবল সমবায়ের দুর্নাম, দুর্নীতি-অভিযোগ দূর হবে এবং সুনাম সৃষ্টি হবে।

অপরদিকে স্বল্প সময়ে নানা বিষয়ে একটু একটু করে আলোচনা করার কারণে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণটি ‘অবহিতকরণ সভা’য় পরিণত হয়। যৌতুক, নারী নির্যাতন ও সমসাময়িক বিষয়াদি সমবায়ীগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সরকারি অন্যান্য মিডিয়া বা আলোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল থাকেন। তাছাড়া এ সকল বিষয়াদি সমবায় বিভাগের ম্যান্ডেটও নয়। এ সকল বিষয়াদিতে অনেক সময় চলে যায়। অপর দিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো প্রশিক্ষণ না থাকায় দিন দিন অকার্যকর হয়ে পড়ছে, সমবায়ীগণ খাতাপত্র লিখনসহ আনুষ্ঠানিক কার্যাদিতে(এজিএম, এমসি সভা) অফিস-নির্ভরশীল (সহকারী পরিদর্শকদের কাছে নির্ভরশীল) হয়ে পড়ছে। এতে নানা অনিয়ম, ঘুস ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। নির্বাচন সম্পর্কে না জানায় মামলার উদ্ভব হচ্ছে, হিসাব ও অডিট না বুঝায় সমিতির মূলধন অবক্ষয় অথবা ক্ষেত্রবিশেষে অর্থ-আত্মসাৎ সংঘটিত হচ্ছে, সমিতির দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ পলাতক হচ্ছে, মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে। অন্য বিভাগের কাজ করে সমবায় বিভাগের কখনো উন্নয়ন হবে না। সমবায়ের কার্যক্রম কেবল একটি ব্যক্তিকে অবহিত রাখলেও সমবায়ের সুনাম(বাস্তবে) বৃদ্ধি পাবে না। সমবায় প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী, সমবায়ীদেরকে দক্ষ-অভিজ্ঞ ও সচেতন, সমবায়ের ব্যবসা ও উদ্যোগকে লাভজনক করা গেলেই কেবল সমবায়ের দুর্নাম, দুর্নীতি-অভিযোগ দূর হবে এবং সুনাম সৃষ্টি হবে। এ জন্য ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণকে ব্যাপকভাবে দক্ষতা-আন্তরিকতার সাথে কাজে লাগাতে হবে।

প্রস্তাবনা

প্রশিক্ষণকে বাংলায় ‘ভ্রাম্যমাণ সমবায় প্রশিক্ষণ’ এবং ইংরেজিতে ‘Non-Institutional Co-operative Training’ বলা যেতে পারে। এ প্রশিক্ষণকে সামগ্রিক প্রশিক্ষণ না রেখে এটিকে ক্ষুদ্র পরিসরে একক ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে পরিণত করা প্রয়োজন। সমবায় সমিতিগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে যে সকল বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে সকল বিষয়কে পৃথক করে একেকটি স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর থেকে এরূপ একাধিক (৮টি) মডিউল অনুমোদিত থাকবে। উক্ত মডিউল থেকে প্রত্যেক উপজেলা সমবায় অফিস তাদের সমবায় সমিতির শ্রেণি ও সংখ্যা এবং তাদের আর্থিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ভিত্তিতে কোর্স সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং বাৎসরিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার জেলা হতে অনুমোদন গ্রহণ করবেন। অপরদিকে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর জন্য অনুমোদিত ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী কোর্সগুলোর মতো স্থানীয়ভাবে আয়বর্ধনমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন (বিশেষ) প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রতিটি জেলা প্রতি বছর ৬টি কোর্স অনুষ্ঠান করবে। জেলা সমবায় অফিস বাজেট পাওয়ার পর জুলাই মাসে কোর্সের ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক বিভাগ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করবে। এরূপ প্রশিক্ষণ ইতিপূর্বে চালু ছিল, এর ফলাফলও অত্যন্ত ভালো ছিল। ১৯৬৪ সালে সমবায় বিভাগে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুভব করে ১০টি

ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের পর ৬০ বছরের ব্যবধানে এর গুরুত্ব ও পরিসর অনেক বেড়েছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত যুব অধিদপ্তর প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সমবায়ে এখন প্রতিটি জেলায় স্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে 'সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' (৬৪টি) স্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ইনস্টিটিউট স্থাপনের আগে থেকেই জেলার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখা খুব দরকার। এরূপ স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ মডিউলের নিম্নরূপ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হলো।

প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ

প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ ৪টি স্তরে বা ৪টি গ্রেডে শ্রেণিবিন্যস্ত থাকবে। গ্রেড-১ এর কমপক্ষে একটি কোর্সের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকলে তিনি পরবর্তী গ্রেড-২ ভুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য হবেন। কোনো সমবায়ী গ্রেড-২ এর যেকোনো একটি কোর্স সম্পন্ন করলে তিনি গ্রেড-৩ এর যোগ্য হবেন। কেউ গ্রেড-৩ সম্পন্ন করলে গ্রেড-৪ এর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের যোগ্য হবেন। ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের গ্রেড-২ সম্পন্নকারী একজন সমবায়ী আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট এর হিসাবসংক্রান্ত বা অডিট সংক্রান্ত বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হতে পারবেন। প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে শুরুতেই টিক চিহ্নযুক্ত প্রশ্নপত্রে ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্নের উত্তর দিবেন, একই প্রশ্নে প্রশিক্ষণ শেষে উত্তর দিবেন। প্রতিটি সেশনের লেকচার শিট সরবরাহ করতে হবে। এ সকল লেকচার শিট অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল আকারে ছাপাতে হবে।

নীচের টেবিলে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রেড ও মডিউল সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো:

গ্রেড	মডিউল নং ও শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রধান বিষয়বস্তু (সেশন সারাংশ)
গ্রেড–১ (হিসাব)	মডিউল–১: খাতাপত্র লিখন ও হিসাব সংরক্ষণ মডিউল–২: হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য হিসাব বিবরণী উপস্থাপন	৫০,০০০ টাকার নিচে/উর্ধ্বে বার্ষিক লেনদেনবিশিষ্ট সমিতির সভাপতি, সম্পাদক বা হিসাবরক্ষক	খাতাপত্রের ধরন ও সংরক্ষণ, অডিটে হিসাব উপস্থাপন ও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার দক্ষতা অর্জন	খাতাপত্র লিখন, সদস্য ভর্তি ও নাম কর্তন, রশিদভিত্তিক আদায় ও পোস্টিং, স্থিতিপত্র প্রস্তুত, লাভ–ক্ষতি হিসাব, বাজেট অনুমোদন
গ্রেড–২ (রেজুলেশন)	মডিউল–৩: সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ও কমিটি গঠন মডিউল–৪: ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও কমিটি গঠন	১০০-এর কম ও অধিক সদস্য বিশিষ্ট সমবায় সমিতির সভাপতি–সম্পাদক	সভা, নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে দক্ষতা অর্জন	সাধারণ ও বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান, রেজুলেশন লিপিবদ্ধ, নির্বাচন তফসিল ও ভোটার তালিকা প্রস্তুতি, নির্বাচন ফলাফল ও হস্তান্তর
গ্রেড–৩ (নিরীক্ষা)	মডিউল–৫: বার্ষিক বাজেট পাশ ও বিনিয়োগ অনুমোদন মডিউল–৬: নিরীক্ষা পরবর্তী কার্যক্রম ও করণীয়	৫ লক্ষ টাকার বেশি ঋণ–বিনিয়োগ বিশিষ্ট সমবায়ের সভাপতি, সম্পাদক, নির্বাহী কর্মকর্তা	বাজেট ও বিনিয়োগ প্রণয়ন, নিরীক্ষা–পরবর্তী করণীয় বাস্তবায়নে দক্ষতা অর্জন	বাজেট প্রস্তুতি, বিনিয়োগ প্রস্তাব, সাধারণ সভায় অনুমোদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, লাভ বন্টন ও সিডিএফ ফি নির্ধারণ
গ্রেড–৪ (ব্যবস্থাপনা)	মডিউল–৭: সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল–৮: আয়বর্ধনমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন (বিশেষ) প্রশিক্ষণ	সকল শ্রেণির সমবায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সদস্যরা	ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দক্ষতা অর্জন	সমবায় আইন–বিধি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা, সদস্য ভর্তি, নির্বাচন, বাজেট, বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প

তদারকি ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation)

সমবায় অধিদপ্তরের ইপি শাখায় একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি মাঠ পর্যায় থেকে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ চাহিদা ও মডিউল প্রস্তাব সংগ্রহ করবে, পর্যালোচনা করবে এবং পরবর্তী বছরের জন্য হালনাগাদ প্রশিক্ষণ মডিউল প্রকাশ করবে। উক্ত মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি–না এবং এ সকল প্রশিক্ষণের ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন করবে। মূল্যায়নের পদ্ধতি হিসেবে জেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিশেষ প্রতিবেদন, অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রতিবেদন, সমবায়ীদের অনলাইন মূল্যায়নের উপর গুরুত্বারোপ করবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সমিতির বার্ষিক অডিট প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চিহ্নিত অকার্যকর সমিতির আর্থিক কার্যক্রম চলমান রাখা যায় কি–না তা পর্যালোচনা করবে।

■ মোঃ মোখলেছুর রহমান: যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী

সিঙ্গাপুরের সমবায় আন্দোলন : বাংলাদেশের জন্য একটি অনুসরণীয় মডেল

সাইয়্যেদাতুন নেছা

সমবায় আন্দোলন বিশ্বব্যাপী আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত মডেল। এটি কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, সামাজিক সুরক্ষা, ন্যায্যতা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর একটি ছোট দ্বীপরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সমবায় খাতকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যা জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, এবং সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য, যেখানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং আর্থিক বৈষম্য এখনো প্রকট, সিঙ্গাপুরের সমবায় মডেল হতে পারে একটি কার্যকর রোল মডেল। এই প্রবন্ধে সিঙ্গাপুরের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস, কাঠামো, আর্থিক ও সামাজিক অবদান এর পাশাপাশি সমবায় সেক্টরে বাংলাদেশের আশানুরুপ সাফল্য না আসার কারণ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিঙ্গাপুরের উদাহরণ কীভাবে অনুসরণযোগ্য হতে পারে, সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন (১৫ লাখ) এর বেশি মানুষ কোনো না কোনো সমবায়ের সদস্য। এটি সিঙ্গাপুরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫% অর্থাৎ প্রতি চারজন নাগরিকের একজন সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে ৯০টির বেশি নিবন্ধিত সমবায় রয়েছে

সিঙ্গাপুরের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস ও কাঠামো

সিঙ্গাপুরে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯২৫ সালে, যখন প্রথম ক্রেডিট কো-অপারেটিভ (The Straits Times Co-operative Thrift and Loan Society) গঠিত হয়। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় তখন অনেক সরকারি কর্মচারী মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে শুরু করে যারা খুব বেশি সুদের হারে ঋণ প্রদান করতো। এই পরিস্থিতিতে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুরে সমবায় ধারণাটি নিয়ে আসে। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার "Co-operative Societies Ordinance" নামক আইন প্রণয়ন করে সমবায় সমিতি গঠনের সুযোগ করে দেয়। এই অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঋণখেলাপি থেকে সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের রক্ষা করা ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণে আনা। প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত হয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে, যা পরে নানা পেশায় বিস্তৃত হয়। স্বাধীনতার পর এই আন্দোলন একটি শক্তিশালী ও সংগঠিত রূপ পায়। ১৯৮০ সালে সিঙ্গাপুর জাতীয় সমবায় ফেডারেশন (SNCF) গঠিত হয় যা সিঙ্গাপুরের সমবায় সমিতিগুলোর একটি শীর্ষ সংগঠন।

বর্তমানে সিঙ্গাপুরের সমবায় খাত পরিচালিত হয় মূলত তিনটি প্রধান শ্রেণিতে:

ক. ক্রেডিট কো-অপারেটিভস– ঋণ ও সঞ্চয় প্রদান।

খ. ভোক্তা সমবায় (Consumer Co-ops)– নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ।

গ. সামাজিক সেবামূলক সমবায় (Social Service Co-ops)– শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিমা ইত্যাদি।

আর্থিক ও সামাজিক সাফল্য

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন (১৫ লাখ) এর বেশি মানুষ কোনো না কোনো সমবায়ের সদস্য। এটি সিঙ্গাপুরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫% অর্থাৎ প্রতি চারজন নাগরিকের একজন সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে ৯০টির বেশি নিবন্ধিত সমবায় রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমিতি সম্পর্কে নিম্নে একটি ধারণা দেওয়া হলো:

প্রধান কোঅপারেটিভ সংগঠনসমূহ

Singapore National Cooperative Federation (SNCF)

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন (SNCF) হচ্ছে জাতীয় স্তরের শীর্ষ সংস্থা যা সকল কোঅপারেটিভদের প্রতিনিধিত্ব করে। SNCF সমবায়গুলোর জন্য নীতি প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ, অনুদান ও সক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। SNCF এর কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- Central Co-operative Fund (CCF) এর মাধ্যমে সমবায়কে অনুদান।
- Start-up Grant- নতুন সমবায়কে SGD ৩০,০০০ পর্যন্ত অনুদান।
- Empowering Communities Fund-SGD ১ মিলিয়ন বরাদ্দ।
- Progressive Workplace Grant- সমবায়ে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা।

NTUC (National Trade Union Congress) FairPrice Co-operative Ltd

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত NTUC FairPrice সিঙ্গাপুরের বৃহত্তম খুচরা বিপণন সমবায়, যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ মিলিয়ন এবং বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় ৪ বিলিয়ন SGD। এই সমবায় সমিতির বিভিন্ন ধরনের রিটেইল ফরম্যাট রয়েছে যেমন খুচরা সুপারমার্কেট, "Finest" ধরনের উচ্চমানের সুপারমার্কেট, "Xtra"-বড় আকৃতির হাইপারমার্কেট ফরম্যাট ইত্যাদি। এদের "Cheers" নামের কনভিনিয়েন্স স্টোর চেইনও রয়েছে। NTUC FairPrice একটি শক্তিশালী এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ সুপারমার্কেট কো-অপারেটিভ। এটি শুধু ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনই করেনি, বরং ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ ও জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে এমন একটি মডেল অনুসরণ করা হলে গ্রাহক সুরক্ষা, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হতে পারে।

NTUC Income

এটি বিমা খাতে অন্যতম বৃহৎ সমবায়, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে যার প্রিমিয়াম আয় ২০২২ সালে ছিল SGD ৪.১ বিলিয়ন এবং ২ মিলিয়নেরও বেশি পলিসিহোল্ডার

রয়েছে। এটি স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী বিমা সুবিধা প্রদান করে এবং মাইক্রো বিমা চালুর মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের ঝুঁকি হ্রাস করে। এছাড়াও রয়েছে NTUC First Campus ও NTUC Health যা শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রবীণ সেবা খাতে অবদান রাখছে।

Singapore Teachers' Co-operative Society:

এটি শিক্ষক সদস্যদের জন্য গঠিত একটি আর্থিক সমবায় প্রতিষ্ঠান। সঞ্চয় ও ঋণ সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষক সমাজকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে। ১০,০০০ এর অধিক শিক্ষক এ সমবায় সমিতির সদস্য যার মোট সম্পদ SGD ২২০ মিলিয়ন এর বেশি।

স্কুল কোঅপারেটিভস

সিঙ্গাপুরে বর্তমানে ৪০টিরও বেশি স্কুল কোঅপারেটিভ রয়েছে (SNCF Annual Report 2022)। প্রায় ১২,০০০ শিক্ষার্থী এর সাথে যুক্ত। SNCF Youth Survey রিপোর্ট (2021) অনুযায়ী ৭৫% শিক্ষার্থী সমবায়ের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও আর্থিক দক্ষতায় আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। এদের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বুকস্টোর, ফুড ক্যান্টিন, স্টুডেন্ট সার্ভিস পরিচালনা ও উদ্যোক্তা ও ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা তৈরি করা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে National University of Singapore (NUS) Co-op শিক্ষার্থীদের জন্য বই, সফটওয়্যার, শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করে। সংক্ষেপে, সিঙ্গাপুরের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কোঅপারেটিভগুলো কেবল ছোট আকারের ব্যবসায় নয় বরং ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণদের দক্ষতা ও মূল্যবোধ তৈরি করছে।

বাংলাদেশের জন্য অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত

সিঙ্গাপুরের সমবায় খাতের অভিজ্ঞতা ও সাফল্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনুসরণীয় হতে পারে। বিশেষ করে এমন কিছু নির্দিষ্ট

খাতে যেখানে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। নিচে সিঙ্গাপুরের সমবায় আন্দোলনের প্রধান অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত এবং সেগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রয়োগযোগ্যতার একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

খাদ্য নিরাপত্তা

NTUC FairPrice-এর মতো ভোক্তা সমবায় বাংলাদেশেও চালু করা যেতে পারে, যাতে করে পণ্যদ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমানো যায়।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

NTUC Health ও First Campus-এর মডেল অনুসরণ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগণের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমবায় খাতকে যুক্ত করে সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব।

যুব নেতৃত্ব ও প্রযুক্তি

সিঙ্গাপুর জাতীয় সমবায় ফেডারেশন (SNCF) যুবদের জন্য 'Youth Co-operative Business Challenge' চালু করেছে। তারা নেতৃত্ব গঠনে অনুদান, প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ প্রদান করে থাকে। SNCF এর Youth Challenge-এর মতো বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে 'Student Co-operatives' চালু করে নেতৃত্ব বিকাশ ও উদ্যোক্তা তৈরি করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ার কারণ

বাংলাদেশে সমবায় খাত দীর্ঘ ইতিহাস সত্ত্বেও প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। যদিও গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য রয়েছে, তবুও বাস্তবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পেছনে মূল কারণসমূহ নিম্নরূপ:

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও তদারকির অভাব

সমবায় অধিদপ্তরের সীমিত দক্ষতা, পর্যাপ্ত জনবল ঘাটতি এবং কার্যকর মনিটরিং ও জবাবদিহিতার অভাবের কারণে অনেক সমবায় টেকসই হতে পারে না। অনেক সমবায় সংগঠন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয় এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আর্থিক অনিয়ম, পরিবারতান্ত্রিক বা অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও

সিঙ্গাপুরে সমবায়গুলো আধুনিক POS (point of sale) সিস্টেম, ডিজিটাল মেম্বারশিপ, ক্লাউড বেসড অডিট ইত্যাদি ব্যবহার করে। বাংলাদেশে অধিকাংশ সমবায় কাগজ-কলম নির্ভর ফলে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা কম থাকে।

দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের আস্থা হারায়। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরে সমবায়গুলো নিবন্ধন থেকে শুরু করে বার্ষিক নিরীক্ষা পর্যন্ত কঠোর তদারকির আওতায় থাকে। সিঙ্গাপুর জাতীয় সমবায় ফেডারেশন (SNCF)-এর মতো অ্যাপেক্স সংস্থা সমবায় সমিতিগুলোর কার্যকারিতা নিয়মিত মূল্যায়ন করে।

মানবসম্পদের দক্ষতা ও নেতৃত্বের অভাব

বাংলাদেশে অনেক সমবায়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রশিক্ষিত না হওয়ায় ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্যোগ ব্যবস্থাপনায় পিছিয়ে থাকায় অনেক ভালো উদ্যোগও ব্যর্থ হয়।

সচেতনতার অভাব ও নেতিবাচক মানসিকতা

অধিকাংশ সমবায়ী সদস্য সমবায় ধারণা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, এবং সদস্যপদ দায়িত্ব সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা রাখে না। এর ফলে সমবায় কার্যক্রম প্রায়ই কেবল নামমাত্র থেকে যায়। এছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে সমবায় মানেই অনিয়ম, ঋণখেলাপি বা রাজনৈতিক খেলা। এই নেতিবাচক ভাবমূর্তি কার্যকর সদস্যভিত্তিক উন্নয়নে বাধা দেয়।

প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা

সিঙ্গাপুরে সমবায়গুলো আধুনিক POS (point of sale) সিস্টেম, ডিজিটাল মেম্বারশিপ, ক্লাউড বেসড অডিট ইত্যাদি ব্যবহার করে। বাংলাদেশে অধিকাংশ সমবায় কাগজ-কলম নির্ভর ফলে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা কম থাকে।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলোর প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহের সক্ষমতা সীমিত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় দুর্বল ফলে সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না।

যুব অংশগ্রহণের ঘাটতি

তরুণ প্রজন্ম সমবায় খাতকে আধুনিক কর্মক্ষেত্র হিসেবে দেখে না, ফলে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয় না।

কার্যকর নীতিমালা ও আইনের অভাব

বাংলাদেশের বিদ্যমান সমবায় আইন ও নীতিমালা আধুনিক ব্যবসায়িক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, ফলে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। সিঙ্গাপুরের Co-operative Societies Act আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেয়।

বাংলাদেশের সমবায় খাতের উন্নয়নে বাস্তবায়ন রোডম্যাপ

নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো সময়াবদ্ধভাবে গ্রহণ করা গেলে বাংলাদেশের সমবায় খাতও সিঙ্গাপুরের মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে:

- সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- দুর্নীতি রোধ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্বাধীন নিরীক্ষা।
- অনলাইন রিপোর্টিং ম্যানেজমেন্ট।
- সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ জোরদার করা।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় করে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা।
- সমবায় ব্যবস্থাপনার উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন।
- উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা।
- স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবায় শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
- যুবকদের জন্য "কো-অপারেটিভ লিডারশিপ প্রোগ্রাম" চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
- সচেতনতা সৃষ্টি।
- সমবায় সমিতির সকল সদস্যদের সমবায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- গণমাধ্যম, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবায় সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচার।
- স্কুল ও কলেজে ছাত্র সমবায় ক্লাব চালু করে সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ডিজিটাল রূপান্তর।
- সমবায়ের জন্য সরকার থেকে ই-ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সরবরাহ।
- সমবায়ী সদস্যদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি প্রশিক্ষণ চালু করা।
- POS সিস্টেম, মোবাইল ব্যাংকিং ইন্টিগ্রেশন এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনা।
- অনলাইন ডাটাবেইস তৈরি করে সকল সমবায় সমিতির তথ্য সংরক্ষণ ও ব্লকচেইন ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন নিরাপদ করা।
- জাতীয় পর্যায়ে "ডিজিটাল কো-অপারেটিভ প্ল্যাটফর্ম" চালু।
- আইন সংস্কার ও নীতি সমন্বয় ।
- বিদ্যমান সমবায় আইন আধুনিকীকরণ।
- সমবায় আইনের দুর্বল দিকগুলো নিয়ে স্টেকহোল্ডার মিটিং।
- আন্তর্জাতিক মান অনুসারে আইন

সংস্কার।

- সমবায় নীতি ও বাণিজ্য নীতির সমন্বয়।
- যুব সম্পৃক্ততা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-যুবকদের সমবায় উদ্যোগে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে "স্টুডেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি" চালু।
- স্টার্টআপ ফান্ডিং প্রোগ্রামের সঙ্গে সমবায়কে যুক্ত করা।
- তরুণদের আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান।
- রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও ভর্তুকি।
- কৃষক ও শ্রমজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য ভর্তুকি।
- কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিপণনে সমবায়কে বিশেষ সুবিধা।
- কর-ছাড় ও রপ্তানি সুবিধা প্রদান।
- সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।
- উদ্যোক্তা ও বাজার সংযোগ।
- ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমবায় পণ্যের সংযোগ ঘটানো।
- স্থানীয় হাট-বাজারে সমবায় কর্নার চালু।
- বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে পার্টনারশিপ।

উপসংহার

সিঙ্গাপুরের সমবায় মডেল সফলভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষার সমন্বয়সাধন করেছে। বাংলাদেশে যেহেতু সমবায় আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস ও ভিত্তি রয়েছে, সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সমবায়কে একটি কার্যকর বিকল্প উন্নয়ন মডেল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এটি কেবল দারিদ্র্য হ্রাসই নয়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশে সমবায়ের সাফল্য সীমিত হলেও, এটি একেবারে অসম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমবায় খাতকেও সিঙ্গাপুরের মতো সাফল্যের পথে আনা সম্ভব। সরকারের সদিচ্ছা, বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং তরুণ সমাজের অংশগ্রহণ এই রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি হতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. Singapore National Co-operative Federation (SNCF) – www.sncf.coop
2. NTUC FairPrice Annual Report 2023–2024
3. NTUC Income Sustainability Report 2022
4. Ministry of Culture, Community and Youth, Singapore – www.mccy.gov.sg
5. Co-operative News – www.thenews.coop
6. Straits Times Reports (2022–2023) – www.straitstimes.com
7. SNCF Youth Survey Report 2021
8. SNCF Annual Report 2022
9. SNCF Education Co-operatives Report 2021

■ সাইয়্যেদাতুন নেছা: যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

গরুর খামারী হওয়া কি লাভজনক? এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন —— প্রকল্পের সর্বশেষ আপডেট কী?

তোফায়েল আহমেদ

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পটি ২০২২ খ্রি. থেকে দেশের ৮টি বিভাগের ৩৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ।

ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশের গ্রামীণ মানুষের গাভিপালন একটি উল্লেখযোগ্য পেশা হিসেবে বিবেচিত। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে গাভি পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন আশানুরূপ উন্নতি লাভ করেনি। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদিত দুধ চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন কারণে দেশের উৎপাদিত দুধের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ বিষয়ে আমি 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হওয়ায় প্রকল্প এলাকাসমূহ পরিদর্শন করে নিম্নরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

কেস স্টাডি-১

ফিরোজা বেগম একজন খামারী। তিনি মাস্টার্সের পর

যে এলাকায় ফ্রিজিয়ান জাতের গাভি পালনের প্রচলন নেই বা যে এলাকায় ফ্রিজিয়ান জাত পালার আবহাওয়া নেই সে এলাকায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে অন্য কোনো উন্নত জাতের বকনা বা গাভি বা উন্নত সংকর জাতের বকনা বা গাভি ক্রয়ের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

একটি সরকারি চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সরকারি চাকরি না পাওয়ায় তিনি হাঁস–মুরগি পালন শুরু করলেন, গরুর খামারও করলেন। কিন্তু খুব বেশি আয় হচ্ছে না। দুধের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। ঘোষ শ্রেণির কাছে জিম্মি হয়ে গেছেন। এখন তিনি একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

কেস স্টাডি-২

সবিতা রানী একজন খামারী। একাজে যতটা লাভ হবে ভাবছিলেন ততটা লাভ হচ্ছে না। দুধের দাম পাচ্ছেন না। এক লিটার দুধের উৎপাদন খরচ ৫৫ টাকা। কিন্তু বাজারে ৫০-৫৫ টাকা করে বিক্রি করতে হচ্ছে। এক শ্রেণির সিন্ডিকেট বা মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে সরাসরি মিষ্টির দোকানে দুধ বিক্রি করতে পারছেন না। তার এলাকায় কোনো চিলিং সেন্টারও নেই যেখানে নিয়মিত দুধ দিতে পারেন।

কেস স্টাডি-৩

রতন বাবু দীর্ঘদিন ধরে গরুর লালনপালন করে আসছেন। করোনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বেশ কিছু গরু বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এ পেশা ছেড়ে দিবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প থেকে লোন নিয়ে নতুন করে শুরু করলেন। কিন্তু গোখাদ্যের দাম যেভাবে বেড়েছে এবং খামার ব্যবস্থাপনায় খরচ যে হারে বেড়েছে সে হারে দুধের দাম বাড়েনি। তাই খামার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। ঋণের টাকা পরিশোধ করবেন কিভাবে সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত!

কেস স্টাডি-৪

মৃনাল ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে এ পেশায় থাকলেও গত দুই বছর আগে এ পেশা ছেড়ে দিয়ে এখন অন্য পেশায় জীবিকা নির্বাহ করছেন। দুধের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে সব দুধ মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! গত দুই বছর আগে মেয়ের বিয়ের সময় দুটি গরু বিক্রি করে দেয়। ছেলের পড়াশোনার জন্য বাকি গরুগুলো বিক্রি করে দেয়।

কেস স্টাডি-৫

সফিকুল ইসলাম, শখের বশে একটি খামার গড়ে তোলেন। কিন্তু গত বছর এক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশিরভাগ গরু মারা যায়। তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তিনি একটি দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্য। কিন্তু সমবায় সমিতির সদস্য হয়েও সমিতি থেকে তিনি কোনো সুযোগ–সুবিধা পাননি।

কেস স্টাডি-৬

রুহুল আমিন, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প থেকে লোন নিয়ে দুটি হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান বকনা কিনেছে। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনো বাচ্চা হয়নি। সরকারি ঋণের (১,৬০,০০০ টাকা) সাথে আরো এক লক্ষ টাকা জোগাড় করে দুটি বকনা ক্রয় করেছিলেন। এদের লালনপালন বাবদ পেয়েছিলেন ৪০,০০০ টাকা। কিন্তু গত এক বছরে খরচ করেছেন প্রায় ২.৫০ লক্ষ টাকা। ফ্রিজিয়ান হওয়ায় রোগবালাই বেশি এবং চিকিৎসা খরচও বেশি হয়েছে। এখন বাচ্চা না হওয়ায় দুধের উৎপাদন হয়নি অথচ ১৩তম মাস থেকেই কিস্তি আদায় শুরু হয়েছে। এখন কি করবেন বুঝতে পারছেন না!

এ অবস্থা অন্যান্য খামারীদেরও এখন কি করা উচিত?

আমি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগদান করে সরাসরি প্রান্তিক খামারীদের সাথে কথা বলেছি। আমার প্রকল্পে এ ছয় ধরনের খামারীসহ বিভিন্ন ধরনের উপকারভোগী রয়েছে। তাদের চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ: (খামারীদের মতে)

- গো-খাদ্যের মূল্য অনেক বেশি বলে তাদের খামার ব্যবস্থাপনায় খরচ অনেক বেশি হচ্ছে।
- হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বা গাভি ক্রয়ের সময় ঠকছে বা ইচ্ছে করে ছোট ও রুগ্ন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা কিনেছে যদিও ঐ এলাকায় ফ্রিজিয়ান জাতের গাভি পালনের অভ্যাস নেই।
- সঠিক জ্ঞান না থাকায় গাভির অসুখ বিসুখ বেশি হচ্ছে এবং চিকিৎসায় অনেক বেশি খরচ হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ফ্রিজিয়ান জাতের উপযুক্ত আবহাওয়া না থাকায় গাভি অসুস্থ হচ্ছে বেশি।
- দুধের বাজারজাতকরণ সমস্যা হচ্ছে। অনেকেই গাভির দুধের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না।
- সমবায় সমিতি কেন গঠন করল, এর গুরুত্ব কি, সঞ্চয়ের গুরুত্ব কি এগুলো না বুঝেই সমিতির সদস্য হয়েছে অথবা সমিতি থেকে কোনো সুযোগ–সুবিধা না পাওয়া।

- এ পেশা থেকে যে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা হওয়া যায় এ বিষয়ে যথেষ্ট সাপোর্ট না পাওয়া।
- সমবায় অধিদপ্তর থেকে যথাযথ মনিটরিং না হওয়া।
- সমবায়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিও এনজিও এর সাথে লিঙ্কেজ না থাকা।
- খামারীদের গাভি পালনসহ আরও কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।
- প্রকল্পের ফেসিলেটর ও কৃত্রিম প্রজনন কর্মী না থাকা।

এ বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তর ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যার ফলে ডিপিপি সংশোধন করে নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বা হবে:

- খামারীদের উন্নত জাতের বকনা বা গাভির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আরো সচেতন করার জন্য আরো বেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- যেহেতু গোখাদ্যের দাম অনেক বেশি তাই উন্নত জাতের গাভির জন্য যে খাবার অতি প্রয়োজনীয় অর্থাৎ কাঁচা ঘাস বা বীজ ফ্রি দেয়া হচ্ছে বা হবে। এতে দুধের উৎপাদন খরচ কমবে।
- যে এলাকায় ফ্রিজিয়ান জাতের গাভি পালনের প্রচলন নেই বা যে এলাকায় ফ্রিজিয়ান জাত পালার আবহাওয়া নেই সে এলাকায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে অন্য কোনো উন্নত জাতের বকনা বা গাভি বা উন্নত সংকর জাতের বকনা বা গাভি ক্রয়ের সুযোগ দেয়া হয়েছে।
- যে এলাকায় কোনো চিলিং প্লান্ট নেই সেই এলাকায় মিল্কভিটা বা আড়ং বা অন্য কোনো দুগ্ধ কোম্পানির চিলিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বাজারে দুধের ন্যায্যমূল্য না পেলে সমবায়ীরা নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দুগ্ধপণ্য যেমন দই, ঘি, বাটার, লাবাং, মাঠা, পনির ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা করা হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন জিও ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ করে দেয়া হবে।
- প্রকল্পের জনবল নেই। কিন্তু প্রতি সমিতি থেকে কমপক্ষে দুই জন সদস্যকে কৃত্রিম প্রজনন কর্মী বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে প্রাণী সেবার দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। এরাই ফেসিলেটর ও কৃত্রিম প্রজনন কর্মী হিসেবে কাজ করবে।
- ব্র্যাক এর সাথে এমওইউ এর ফলে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পাশাপাশি খামারীরা ব্র্যাক এর কৃত্রিম প্রজনন সহযোগিতা, চিকিৎসা সেবা, গাভি বিমাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সুবিধা পাবেন।
- বেশ কিছু ক্ষেত্রে যেহেতু ফ্রিজিয়ান জাতের গাভি মা হতে সময় লাগে তাই ঋণের গ্রেস পিরিয়ড ১২ মাস থেকে ১৫ মাস করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- আলাদা আলাদা খামারী নির্বাচন করে ঋণ দেয়ার চেয়ে সমবায় সমিতির সদস্য করে ঋণ দেয়ার কারণ কি? কেন সমিতি গঠন করা হলো? সমিতি গঠন করে খামারিদের কি লাভ? এখানে মাসিক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে কিভাবে সম্মিলিত পুঁজি থেকে বিনিয়োগ করে সবাই লাভবান হওয়া যায়? এসব বিষয় জানার জন্য হিসাব সংরক্ষণ ও সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে।
- গরুর গোবর বা পায়খানা বা অন্যান্য ভাবে প্রচুর মিথেন গ্যাস নিঃসরণ হয় যা গ্রিন হাউজ গ্যাসও। এটা কমানোর জন্য গরুর খাবার ম্যানেজমেন্ট করে এবং গরুর পায়খানা থেকে বায়োগ্যাস, ভার্মিকম্পোস্ট, ট্রাইকো কম্পোস্টসহ জৈব সার তৈরি করে কৃষি উদ্যোক্তা হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- এ অর্থবছর থেকে খামারীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ঔষধ ও ভ্যাকসিন সুবিধার জন্য এলআরআই এর সাথে এমওইউ এবং এর পাশাপাশি বিদেশ থেকে কিছু জরুরি ভ্যাকসিন বা ঔষধ আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রকল্প দপ্তর হতে খামারীদের রেকর্ড কিপিং এর জন্য কয়েকটি ছক করে দিয়েছি যা নিয়মিত পূরণ করা বাধ্যতামূলক।
- প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রকল্পের সমিতির পরিদর্শন বা মনিটরিং ছক বা খসড়া প্রতিবেদন করে দিয়েছি যা নিয়মিত পূরণ করে পাঠালে মনিটরিং কার্যকর হবে।
- সমিতির কার্যক্রম ডিজিটাল সফটওয়্যার এর আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভালো ভালো উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব উদ্যোক্তা ভালো পারফরমেন্স দেখাবে তাদেরকে যান্ত্রিক সাপোর্টসহ বেশ কিছু সাপোর্ট দেয়া হবে।

খামারীদের আরো সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও এনজিওদের সাথে আলোচনা চলছে। খামারীরা খুব শীঘ্রই এর সুফল পাবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রকল্প সংক্রান্ত আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা, দুগ্ধ সমবায়ীদের ভোগান্তি, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এবং উক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ হতে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উত্তরণের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে মূল্যবান মতামত এই ই-মেইলে (milkproject.pd@gmail.com) প্রেরণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

■ তোফায়েল আহমেদ: প্রকল্প পরিচালক, "দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প

সমবায় সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতা

খোন্দকার হুমায়ূন কবীর

সমবায় একটি প্রাচীন এবং পরীক্ষিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মিলেমিশে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পথে হাঁটে। তবে সমবায় কেবল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্যই নয় বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রও। এই দায়বদ্ধতা সমাজে ন্যায়বিচার, সাম্য, সহানুভূতি ও সম্মিলিত অগ্রগতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস- ২০২৫ উদযাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"। সাম্য ও সমতার দেশ গড়তে হলে দেশের সমবায় সমিতিগুলোকে আবশ্যিকভাবে কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের কৃষক, শ্রমিক, নারী-পুরুষ, উদ্যোক্তা, জেলে, তাঁতি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা সম্ভব। আর সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার হচ্ছে- "কেউ পিছিয়ে থাকব না"। এই নীতি দেশের জনগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। সমবায় সমিতিগুলো সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে বৈষম্য একটি বড় সামাজিক সমস্যা। আয়, সম্পদ, সুযোগ ও ক্ষমতার বৈষম্য সমাজে অসাম্য ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা নিরসনের অন্যতম কার্যকর উপায় হতে পারে সমবায় সমিতির সামাজিক দায়িত্ব পালন যা সম্মিলিতভাবে সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

সমবায়ের মূলভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমতা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হওয়া। এতে সম্পদের সুষম বণ্টন হয় যা বৈষম্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। সমবায় সমিতির সদস্যগণ যদি একে অপরকে সহযোগিতা করে একে অপরের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে তবেই পারস্পরিক সহানুভূতি তৈরি হয়, বৈষম্য দূর হয়, সমাজে সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।

সমবায় অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ১,৭৪,৯৩০টি সমবায় সমিতির ছায়াতলে প্রায় ১,২৩,৮৭,২১৬ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

সমবায়ের সাথে যুক্ত রয়েছে। এসব সমিতির কার্যকরী মূলধন প্রায় ৩৮,১০,৭৮১ লক্ষ টাকা। সম্পদের পরিমাণ ৩৮,৮১,১৮১ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং জনশক্তির সমবায় সমিতিসমূহ পুঁজি গঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব যা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে কাজ করছে।

সমবায়ের মূল দর্শন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি: সমবায়ের মূলমন্ত্র "একতা, সমতা, সহযোগিতা"। এটি সবসময়ই গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যেখানে প্রত্যেক সদস্যের মতামত ও অংশগ্রহণ সমান গুরুত্ব পায়। এই কাঠামোই সমাজে দায়িত্বশীলতা, অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতা গড়ে তোলে।

সমবায় সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকসমূহ

শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

সমবায় সমিতির দায়িত্ব হচ্ছে তার সদস্যদের ও স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে সচেতন করে তোলা। এক্ষেত্রে তারা প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন

সমবায়ের মাধ্যমে নারীরা সহজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া সমবায় সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। বিশেষ করে সমিতির নারী সদস্যরা হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে । তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। অনেক নারী সমবায়ী দেশে ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন এর ফলে বাংলাদেশের নারী সমবায়ীরা এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখছেন ।

দারিদ্র্য দূরীকরণ

ক্ষুদ্রঋণ, যৌথ ব্যবসা, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতি সমাজের দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়নে সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা সহজেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারে। আশার কথা হলো- বর্তমানে অনেক সমবায় সমিতি পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। এরা জৈব সার প্রস্তুত, বৃক্ষরোপণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করছে। এটি সমাজে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখছে।

দুর্যোগকালীন সহায়তা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারির সময় সমবায় সমিতি স্থানীয় জনগণকে খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয় ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা দিয়ে আসছে। সমবায়ীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

মানবিক সম্পর্ক ও সামাজিক সংহতি গঠন

সমবায় সমিতি তার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এটি সমাজে একধরনের সামাজিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে।

এছাড়াও, সমবায় সমিতিগুলো আরও কিছু সামাজিক কাজ করতে পারে। এসব কাজের মাধ্যমে তারা মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারে। কাজগুলো হতে পারে-

- রক্তদান,
- ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প,
- ফ্রি আই ক্যাম্প,
- ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধি,
- নববর্ষ বরণ ইত্যাদি।

সমবায় সমিতির পালনীয় সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে আরও থাকতে পারে-

- সদস্যদের স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয় বহন করা।
- যানবাহন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা।
- অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বহন করা।
- ক্ষতিকর রোগের চিকিৎসাজনিত ব্যয় পরিশোধ করা ।
- মাতৃত্বকালীন খরচ দেওয়া।
- প্রসবকালীন অস্ত্রপচারের খরচ দেওয়া
- দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ব্যয় দেওয়া।
- জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের তীর্থযাত্রা বাবদ ব্যয় সরবরাহ করা।
- জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সম্মানসূচক ডিগ্রি অর্জনজনিত ব্যয় মিটানো।
- সদস্যদের জন্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যয় বহন করা।
- বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া।

এসব কল্যাণমূলক কাজ সমবায় সমিতির ওপর মানুষের আস্থা মজবুত করে।

আশার কথা হলো- ইতোমধ্যে বাংলাদেশের কিছু সমবায় সমিতি স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই, পোশাক ও টিফিন সরবরাহ করছে। আবার কিছু সমবায় সমিতি নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাতৃত্বকালীন সেবার কাজেও সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, সমবায় সমিতি শুধু সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নই করে না বরং সমাজের সার্বিক উন্নয়নের এক কার্যকর মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। এটি সমাজে নৈতিকতা, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করে একটি দায়িত্বশীল ও মানবিক পরিবেশ গড়ে তোলে।

■ খোন্দকার হুমায়ূন কবীর: যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

সমবায় শক্তিতে অনুপ্রাণিত একটি প্রতিষ্ঠান

সামিয়া সুলতানা

দেশের অবহেলিত নারীদের উন্নয়ন আর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। ক্ষমতায়ন একজন নারীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, ফলে সে সমস্যা সমাধান করতে শেখে। সমবায় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমনই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা কিছু মহিলা মিলে গঠিত হয় "একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ"।

সমবায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে থাকলেও সমবায়ের মাধ্যমে তারা সংগঠিত হয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। ফলে পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

"জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়"

সমবায়ের এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জনবলের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমবায় দপ্তর কর্তৃক "একতা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" ৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে নিবন্ধন লাভ করে। শুরুতে মাত্র ২০ জন সদস্য আর ৬৩,৩০০ টাকা মূলধন নিয়ে গুটি গুটি পায়ে এটি কাজ শুরু করে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলা জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টিসহ, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার মূল লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠে "একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ"। একইসাথে মহিলাদের মানবীয়

গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত ও বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্ব গঠনে সহায়তা করা সমিতি গঠনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

ঢাকা শিশু এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন এর সার্বিক সহযোগিতায় ২০/২৫ জন মহিলা নিয়ে এক একটি দল গঠন করে তাদের স্বাক্ষর জ্ঞানদানপূর্বক উন্নয়ন দল হিসেবে কাজ করা শুরু হলে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তারা "একতা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" নামে নিবন্ধিত হয়। নিচের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।

- সমাজকে কু-সংস্কার মুক্ত করা।
- সমবায়ের নীতি ও বিধান মোতাবেক সদস্যদের পরিচালনা করা।
- সদস্যদের লাভজনক, উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রদান করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।
- নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণ।
- ক্ষুদ্র হতে বৃহত্তর শক্তিতে পরিণত হওয়া।
- সমিতিকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।

সমিতির সদস্যরা উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের অদম্য লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "নিয়তে বরকত"। সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য মহত হওয়ায় এর সাফল্য এসেছে সহজেই।

নিবন্ধিত উপআইন অনুযায়ী সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকা রাজধানীর মোহাম্মদপুর, হাজারিবাগ, আদাবর, লালবাগ, ধানমন্ডি ও কামরাঙ্গীরচর এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। সমিতির সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও নিরলস প্রচেষ্টায় বর্তমানে এই সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ২,৫০০ জনে উন্নীত হয়েছে। সমিতির সদস্যদের বর্তমান মূলধন প্রায় ২,৮০,৪৭,২৮৭ এবং কার্যকরী মূলধন ৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে সমিতি হতে সদস্যরা বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ লাভ করছে। ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেকেই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। কর্মীদের মেধা, মনন ও পরিশ্রমে একতা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে ২০২৩ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে।

সমিতির স্বপ্ন

মানুষকে স্বপ্ন যেমন বাঁচিয়ে রাখে তেমনি প্রতিটি সমিতির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে থাকে কিছু স্বপ্ন। একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তার প্রতিটি সদস্যকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা ও কুসংস্কার মুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সদস্যদের একতা ও নিষ্ঠায় এই সমবায়ের পরিচিতি ছড়িয়ে যাবে জাতীয় হতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটাই সমিতির উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন। সমিতির কর্মীদের মেধা, মনন ও পরিশ্রমে সমিতি পৌঁছে যাবে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে এই স্বপ্ন নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।

সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম

সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে বসবাসরত ১৮-৪৫ বছর বয়সের মহিলারা ভর্তি ফি বাবদ ১০০ প্রদান করে শেয়ার সদস্য হতে পারবেন। প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সদস্যদের সর্বনিম্ন ১০০ টাকার শেয়ার জমা দিতে হয়। ফলে সমিতিতে সদস্যদের মালিকানা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সদস্যদের ভর্তির বয়সসীমা অন্তত ১ বছর হলে এবং তার শেয়ার জমার পরিমাণ ৬,০০০ হলে প্রথম একজন সদস্যকে ঋণ প্রদান করা হয়। সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুসরণপূর্বক জমাকৃত শেয়ারের পাঁচগুণ পরিমাণ সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

এছাড়া সমিতির রয়েছে সঞ্চয় প্রকল্প। একজন সদস্য ৫০ টাকা দিয়ে সঞ্চয় সদস্য হতে পারবে। সদস্যদের শেখানো হয় দুটি মন্ত্র- "সঞ্চয় করিব হাসি-খুশি থাকিব" আর "সঞ্চয় করি দেশ গড়ি"। এই মন্ত্র দুটি সদস্যদেরকে সঞ্চয়ী মনোভাবী হতে উদ্বুদ্ধ করছে। সদস্যরা সঞ্চয় করলে তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের টাকা উত্তোলন করতে পারে। তবে তার হিসাবে সর্বনিম্ন ৩০০ জমা রাখতে হবে। সদস্যদেরকে বার্ষিক ৫% হারে সুদ সঞ্চিতি প্রদান করা হয়।

এছাড়াও সমিতির রয়েছে কিছু প্রকল্প যার মাধ্যমে বিশেষ কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়। একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমানে চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

- সঞ্চয় প্রকল্প
- শিশু সঞ্চয় প্রকল্প
- সাধারণ ঋণ
- বিশেষ ঋণ
- একতা ফ্যাশন
- একতা বাহারী শপ
- সুদিন প্রকল্প
- শিশু সঞ্চয় প্রকল্প

০-১৮ বছরের মেয়ে শিশুরাই কেবল এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবে। সমিতির সদস্যদের সন্তানদের এবং সদস্যবহির্ভূত সাধারণ শিশুদের মধ্যে সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু সঞ্চয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শিশুরা মাসিক সর্বনিম্ন ১০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারে। শিশু সদস্যদেরকে বছরে ২টি খাতা ও ৬টি কলম বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। শিশুদের সঞ্চিত সঞ্চয়ের উপর বছর শেষে মুনাফা প্রদান করা হয়। বার্ষিক ৭% হারে সুদ সঞ্চিতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে সমিতির শিশু সদস্য সংখ্যা ৮৫০ জন যাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৭,৮৩,৯৩৪ টাকা।

একতা বাহারী শপ প্রকল্প

একতা বাহারী শপ প্রকল্পের অধীনে সমিতির একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে। উক্ত দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল ধরনের পণ্য বিক্রয় করা হয়। সমিতির সদস্যদের একটি বাজার কার্ড দেওয়া হয় যার মাধ্যমে তারা ন্যায্যমূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য উক্ত দোকান থেকে ক্রয় করতে পারেন। তাছাড়া সমিতির সদস্যদের এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বাকি পণ্য ক্রয় করার সুবিধা রয়েছে।

একতা ফ্যাশন প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে সমিতির একটি মিনি গার্মেন্টস রয়েছে যা একতা ফ্যাশন নামে পরিচিত। প্রথমদিকে সমিতি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গার্মেন্টসটি পরিচালনা করতো। বর্তমানে গার্মেন্টসটি সমিতির একজন সদস্যের নিকট লিজ প্রদান করা হয়েছে। তিনি সমিতিকে গার্মেন্টস থেকে যা লাভ হয় তার একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে।

সুদিন প্রকল্প

সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে সুদিন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে যে পরিমাণ সঞ্চয় জমা নেওয়া হয় তার আট বছর পর দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়া হয়।

একতা হাউজিং প্রকল্প

সদ্যসদের আবাসন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে হাউজিং প্রকল্প করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতির প্রায় ১০০ জন সদস্য তাদের ভবিষ্যৎ আবাসন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে হাউজিং ডিপোজিট প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছেন। ভবিষ্যতে এ ডিপোজিটের মাধ্যমে জমি ক্রয় করে সমিতির সদস্যদের জন্য হাউজিং প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

সমবায় নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ও সাক্ষরতার সুযোগ তৈরি করে। ফলে মহিলারা আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে নিজেরা এগিয়ে যায় এবং পরিবারকেও এগিয়ে নিতে পারে। সমবায় মহিলাদের স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অনেক সমবায় সংগঠন যৌথভাবে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি সচেতনতা ইত্যাদি কার্যক্রম চালায়। এতে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ে ওঠে। "একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ" এরও রয়েছে তেমন কিছু সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। যেমন:

- কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সমিতির অফিসে প্রতি আর্থিক বছরে বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং, সেলাই, এমব্রয়ডরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্য, বেকার যুবতী-মহিলাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, সমবায় দিবস, গণসাক্ষরতা দিবসসহ জাতীয় দিবসসমূহ পালন ও উদযাপন করা।
- সমিতির কর্মএলাকায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বয়স্ক মহিলাদের নৈশ শিক্ষা প্রদান করা।
- দরিদ্র ব্যক্তিদের শীতবস্ত্র বিতরণ, বন্যার্তদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড সম্পাদন করা।
- সমিতির কর্মএলাকায় সকল পেশায় নিয়োজিত মহিলা সদস্যগণের উন্নয়নমূলক সার্বিক কাজে সহায়তা ও শিশু পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম সমিতি অব্যাহত রেখেছে।

সমিতির বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রম

একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষাদান ও পথশিশুদের শিক্ষার সুযোগ দান করে থাকে। কর্মজীবী শিশুদের বই, খাতা কলম, ভর্তি, বেতন সমস্ত খরচ বহন করা হয়। তাছাড়া সদস্যদের বাচ্চাদের বিনামূল্যে গান, আর্ট, নাচ শিখানো হয়। ফলে সদস্যরা যেমন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে তেমনি সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে বিকাশ লাভ করছে।

সমিতির একটি স্লোগান হলো- "কর্মসংস্থান আমাদের লক্ষ্য, আত্মনির্ভরশীল সমাজ আমাদের স্বপ্ন"

সমিতির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ফলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে, একইসাথে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। তাদের যে স্বপ্ন আত্মনির্ভরশীল হওয়া সে পথে তারা এগিয়ে যাবে। সমবায়ী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড একটি সফল সমবায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য সমিতির জন্য একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে।

■ সামিয়া সুলতানা: উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমবায় :
সাম্যের টেকসই পথচলা

মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার

জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"। এই প্রতিপাদ্যের ভেতরে নিহিত আছে সমবায়ের মূল দর্শন, যা হলো - একজন নয়, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। আধুনিক বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো উদ্যোক্তা উন্নয়ন। উদ্যোক্তা মানেই নতুন ধারণা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সৃজনশীলতা এবং আত্মনির্ভরতার চর্চা। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমবায় হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল। এই প্রবন্ধে আমি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা, চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমবায়ের দর্শন ও প্রাসঙ্গিকতা

সমবায়ের মূল দর্শন হলো "সবার জন্য সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণ"। একজন উদ্যোক্তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একা সিদ্ধান্ত নেওয়া, ঝুঁকি বহন করা এবং বাজারে প্রতিযোগিতা করা। সমবায় কাঠামো এসব চ্যালেঞ্জকে ভাগাভাগি করে নেয়। এখানে ব্যক্তির সীমিত শক্তি ও মূলধনকে অনেক মানুষের সম্মিলিত শক্তি ও সম্পদে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি কমিয়ে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ দিক থেকে সমবায় শুধু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং সামাজিক নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক।

ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে-পুঁজির সংকট, দক্ষতার অভাব, বাজারে প্রবেশের সুযোগ না পাওয়া, প্রশাসনিক জটিলতা ইত্যাদি। সমবায় কাঠামো এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সহজে অতিক্রম করার পথ দেখাতে পারে।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান। তবে এ উন্নয়নের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো বেকারত্ব সমস্যা, বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ নতুন শ্রমশক্তি যুক্ত হচ্ছে, অথচ পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেই এ বিপুল কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা ও যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে-পুঁজির সংকট, দক্ষতার অভাব, বাজারে প্রবেশের সুযোগ না পাওয়া, প্রশাসনিক জটিলতা ইত্যাদি। সমবায় কাঠামো এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সহজে অতিক্রম করার পথ দেখাতে পারে।

অন্যদিকে, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ আমাদের সামনে নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। “স্টার্টআপ কালচার”, ই-কমার্স, অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে। সমবায়ের মাধ্যমে এসব সুযোগকে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমবায়ের অবদান

পুঁজির সংহতি

সমবায়ের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে সম্মিলিত মূলধনে রূপান্তরিত করা। ব্যক্তিগতভাবে একজন উদ্যোক্তার পক্ষে বড় মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হলেও সমবায়ের মাধ্যমে শত শত সদস্যের ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্র হয়ে উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন বহুমুখী, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির কথা উল্লেখ করা যায়, যারা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করছে।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

উদ্যোক্তার শুধু পুঁজি থাকলেই হয় না; তার জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়িক জ্ঞান, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, বিপণন কৌশল এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা। সমবায়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যোক্তারা সহজেই এসব দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় একাডেমি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে শত শত উদ্যোক্তা ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

বাজার সুবিধা

উদ্যোক্তা উন্নয়নের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো বাজারে প্রবেশ। ছোট উদ্যোক্তা একা বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। সমবায়ের সম্মিলিত বিপণন ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণ ও পরিবহনের সুবিধা উদ্যোক্তাদের ব্যবসাকে টেকসই করে গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে সমবায় ই-কমার্স ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা পাচ্ছে।

আর্থসামাজিক নিরাপত্তা

সমবায় উদ্যোক্তাদের জন্য শুধু ব্যবসায়িক নয়, সামাজিক নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করে। যেমন-স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, দুর্ঘটনা বিমা ইত্যাদি সুবিধা অনেক সমবায় সমিতি ইতোমধ্যে চালু করেছে। এতে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি মোকাবিলায় আশ্বস্ত হন এবং দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগে যুক্ত হতে উৎসাহ পান।

কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সমবায়

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কৃষি। এখানে উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিপুল সুযোগ রয়েছে।

- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ,
- দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য,
- মাছ ও মাংস প্রক্রিয়াজাত শিল্প,
- জৈব সার ও কৃষিযন্ত্র তৈরি,

এসব ক্ষেত্র সমবায় কাঠামোয় উদ্যোক্তাদের একত্রিত করে জাতীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি করতে পারে।

নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের জন্য সমবায়

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা একা ব্যবসা শুরু করতে পারলেও সামাজিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে তা টিকিয়ে রাখতে পারে না। সমবায় কাঠামো তাদের নিরাপদ আশ্রয় দেয়, যেখানে তারা সমানভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, মূলধন পায় এবং একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে।

অন্যদিকে, তরুণদের উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, তথ্যপ্রযুক্তি, ফুড প্রসেসিং, ট্যুরিজম- এসব খাত তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ তাদের জন্য নেটওয়ার্কিং, প্রশিক্ষণ

সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি মানেই সাম্য, সমতা ও সম্মিলিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়" কথাটি উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

ও মূলধন সরবরাহ করে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

যুব উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ কালচার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশই তরুণ। তাদের শক্তি ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। তরুণদের জন্য স্টার্টআপ সংস্কৃতি এখন খুব জনপ্রিয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে স্টার্টআপ পরিচালনায় মূলধন সংকট, নেটওয়ার্কিং সমস্যা ও বাজারে প্রবেশাধিকার সীমিত।

সমবায়ের মাধ্যমে তরুণরা-

স্টার্টআপ ফান্ড তৈরি করতে পারে, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেতে পারে, বাজারে একসঙ্গে প্রবেশ করতে পারে। এতে ঝুঁকি কমে এবং দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসা টেকসই হয়।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইতোমধ্যেই অনেক সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সমবায়ের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, এই মডেল কেবল স্থানীয় অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নকেও এগিয়ে নিয়ে যায়।

ভারতের SEWA ব্যাংক (Self-Employed Women's Association Bank)

ভারতের আহমেদাবাদভিত্তিক SEWA ব্যাংক বিশ্বের অন্যতম সফল নারীকেন্দ্রিক সমবায় মডেল। গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার, সেলাইকর্মী, এমন নারীরা এই ব্যাংকের সদস্য হয়ে ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা দিয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি: যারা আগে ব্যাংকের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন না, তারা আজ নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

নারীর ক্ষমতায়ন: শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। নারীরা পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়েছে।

শিক্ষণীয় দিক: বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ মডেল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদের গ্রামীণ নারীরাও ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে বড় স্বপ্ন পূরণ করতে পারে।

ইউরোপের কৃষি সমবায়

ইউরোপের বহু দেশ, বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, জার্মানি, কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমগ্রবিশ্বে উদাহরণ তৈরি করেছে।

খাদ্য উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ: কৃষকরা শুধু ফসল ফলায় না, বরং প্রক্রিয়াজাত শিল্প, রপ্তানি ও বিপণনেও অংশ নেয়।

বাজার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা: সমবায়ভিত্তিক বৃহৎ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায় এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে।

শিক্ষণীয় দিক: বাংলাদেশের কৃষকরা যদি এ মডেল অনুসরণ করে পণ্যের ভ্যালু-চেইনে অংশ নেয় তবে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেডিট ইউনিয়ন

উত্তর আমেরিকায় ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

সহজ শর্তে ঋণপ্রদান: বাণিজ্যিক ব্যাংকের জটিলতা এড়িয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কম সুদে ঋণ পাচ্ছে।

স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ: এসব সমবায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ব্যবসা, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষণীয় দিক: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যবসায়ীরা যদি সমবায়ভিত্তিক আর্থিক সেবায় সহজে প্রবেশাধিকার পায়, তবে তারা দ্রুত উন্নতি করতে পারবে।

পূর্ব এশিয়ার সমবায় অভিজ্ঞতা (জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া)

জাপানের JA Group এবং কোরিয়ার NACF (National Agricultural Cooperative Federation) কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নের অসাধারণ উদাহরণ।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

কৃষকদের শুধু উৎপাদক নয় বরং পূর্ণাঙ্গ উদ্যোক্তায় রূপান্তর করেছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষাতেও সমবায়ের ভূমিকা বিস্তৃত।

বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা

এসব আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের

জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

- SEWA মডেল: নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে।
- ইউরোপীয় মডেল: কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পে।
- ক্রেডিট ইউনিয়ন মডেল: ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার অর্থায়নে।
- জাপান-কোরিয়া মডেল: প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উদ্যোক্তা গঠনে।

বাংলাদেশ যদি এসব অভিজ্ঞতা স্থানীয় প্রেক্ষাপটে রূপান্তর করতে পারে তবে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে।

প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সমবায়ের সুযোগ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রযুক্তি অপরিহার্য। এখন ব্যবসা মানেই শুধু দোকান বা বাজার নয়; বরং ই-কমার্স, ডিজিটাল মার্কেটিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এবং অনলাইন সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা। সমবায় কাঠামো ব্যবহার করে সদস্যরা একসঙ্গে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পণ্য বিক্রি করতে পারে, ডিজিটাল অ্যাপের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে এবং সাপ্লাই চেইনকে দক্ষ করতে পারে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ডিজিটাল সমবায় প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে যা উদ্যোক্তাদের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: সমতায় সমবায়

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ সমবায় সমিতি রয়েছে। যদি প্রতিটি সমবায় অন্তত ১০ জন উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারে, তবে দেশে কয়েক কোটি উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। এতে শুধু কর্মসংস্থানই বাড়বে না, দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং সাম্য ও সমতার ভিত্তিতে এক নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবে।

নীতিগত সুপারিশ

বাংলাদেশে উদ্যোক্তা উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা আরও কার্যকর করতে হলে কিছু নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. সমবায়ভিত্তিক স্টার্টআপ ফান্ড গঠন– তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ তহবিল।
২. ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা– সমবায় কাঠামোয় ব্যবসা আইডিয়া যাচাই, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগের সুযোগ।
৩. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা– সুদমুক্ত ঋণ, কর ছাড় এবং বাজারে অগ্রাধিকার সুবিধা।
৪. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সহযোগিতা– বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সমবায়ের মধ্যে সমন্বিত কর্মসূচি।
৫. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি– ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং এবং অনলাইন মার্কেটিংয়ে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগকে সহায়তা।
৬. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা– উন্নত দেশগুলোর সমবায় অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ।

উপসংহার

উদ্যোক্তা উন্নয়ন শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না এটি দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেয়। সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি মানেই সাম্য, সমতা ও সম্মিলিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়" কথাটি উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। যদি আমরা সমবায় কাঠামোয় উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে পারি, তবে বাংলাদেশ হবে একটি সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই উন্নয়নের দেশ।

■ মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার: উপনিবন্ধক (প্রশাসন), বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

LDC থেকে উত্তরণে
সমবায়ের ভূমিকা

আইনিন নাঈম ফিমা

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়া যেমন গৌরবের, তেমনি তা চ্যালেঞ্জেরও বটে। ১৯৭১ সালে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করা হয়। ১৯৭৫ সালে এলডিসি তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এলডিসিভুক্ত দেশ হওয়ার কারণে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধাসহ নানা সুবিধা পেয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে। যার মধ্যে এশিয়া অঞ্চলের ৮টি , আফ্রিকা অঞ্চলের ৩২টি, ক্যারিবীয় ১টি ও প্যাসিফিকের ৩টি দেশ এ তালিকায় রয়েছে। এলডিসি দেশগুলোও এক ধরনের উন্নয়নশীল দেশ। যেসব দেশের সক্ষমতা তুলনামূলক কম, তাদের এই তালিকায় রাখা হয়। আগামী পাঁচ বছরে এলডিসি তালিকা থেকে বের হতে অপেক্ষায় আছে ছয়টি দেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের তালিকায় আরো দুটি দেশ লাওস ও নেপাল আছে। এ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকে সব মিলিয়ে মাত্র আটটি দেশ: বতসোয়ানা ১৯৯৪, কেপ ভার্দে ২০০৭, মালদ্বীপ ২০১১, সামোয়া ২০১৪, ইকুইটোরিয়াল গিনি ২০১৭, ভানুয়াতু ২০২০, ভুটান ২০২৩ এবং সর্বশেষ সাও টোমো অ্যান্ড প্রিন্সেপ ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে বের হয়েছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) তিনটি মূল সূচকের ভিত্তিতে দেশগুলোকে LDC থেকে

উন্নয়নশীল দেশের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে দক্ষ মানবসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বর্তমানে ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে’ অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে, তাই এ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব।

উত্তরণে বিবেচনা করে:

১. আয় সূচক (Gross National Income - GNI per capita): একটি দেশের মাথাপিছু আয় নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি হলে এটি পূরণ বলে ধরা হয়।
২. মানবসম্পদ সূচক (Human Assets Index - HAI): শিক্ষা, পুষ্টি, শিশুমৃত্যু, স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা ইত্যাদি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৩. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকির সূচক (Economic and Environmental Vulnerability Index– EVI): প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যের অভাব ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

২০১৮ সালের ১২-১৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সিডিপির ২০তম অধিবেশনের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো এলডিসি থেকে উত্তরণের মাপকাঠি অর্থাৎ তিনটি সূচকেই নির্ধারিত সীমা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০২১ সালের ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সিডিপির ২৩তম অধিবেশনের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকেরই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। টানা দুটি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় সিডিপি বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) বরাবর সুপারিশসহ প্রতিবেদন পাঠায়। এলডিসি উত্তরণ নীতিমালা অনুযায়ী ইকোসক ঐ বছরের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠায়। করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশ দুই বছর বর্ধিত সময়ের আহ্বান জানালে ২০২১ সালের ১১ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ পাঁচ বছর প্রস্তুতিমূলক সময় দিয়ে এলডিসি উত্তরণসংক্রান্ত ইকোসকের প্রতিবেদন রেজুলেশনের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশ জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এ অর্জন বিশ্বদরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং আরো অধিকতর উন্নয়নের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। ২০২১ সালে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে ২০২৬ সালে এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ দেয়।

উন্নয়নশীল দেশের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে দক্ষ মানবসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বর্তমানে ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে’ অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে, তাই এ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য তরুণ সমাজকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের সমবায় খাত গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ সৃষ্টির একটি কার্যকর মডেল হিসেবে কাজ করছে। মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ১,৭৮,৬৬৭টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১,২৫,২১,৩১২ জন সমবায়ী সমবায় সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমবায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, পর্যটন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, এবং হস্তশিল্পভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তুলেছে, যেখানে সদস্যরা সরাসরি কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। এসব সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যরা যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ, উৎপাদন, বিপণন ও মুনাফা ভাগ করে নিচ্ছে, যা শুধু ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধিই নয়, বরং পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সম্পদ সঞ্চয়ের পথ তৈরি করছে। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হওয়ায় কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদকরা মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা বিকাশ ও সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে, যা এলডিসি উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

সমবায় অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতি গঠনমূলক দপ্তর। সমবায় অধিদপ্তর জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং এটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে একটি অধিদপ্তর। সমবায় সমিতির নিবন্ধনসহ বিধিগত বিভিন্ন সেবা, আইনগত পরামর্শ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকোণ্ডের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করা ও জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সমবায় অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পল্লী নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন এ দপ্তর সুপ্রাচীনকাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সমবায় সমিতি আইন এবং সমবায়

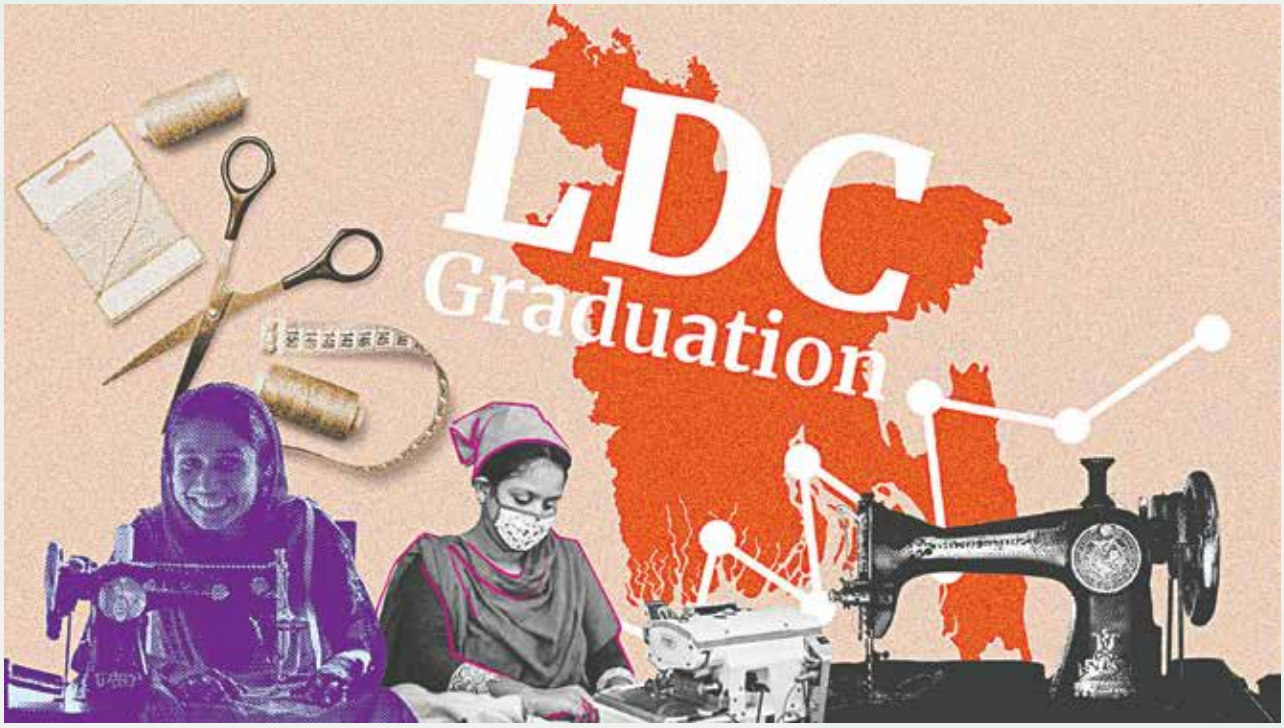

সমিতির বিধিমালার আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২৬ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের পরিক্রমায় দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রস্তুতি নিতে হবে। LDC থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং টেকসই অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর সরাসরি অবদান রাখতে পারে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত : বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি বাংলাদেশের এলডিসি (LDC) উত্তরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করছে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এলডিসি থেকে উত্তরণের অন্যতম প্রধান সূচক, যা এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। সমবায় সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্ব, হিসাবরক্ষণ, ডিজিটাল লেনদেন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তারা আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হওয়ায় আয় বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে, যা এলডিসি উত্তরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণে সহায়তা করছে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুধুমাত্র সদস্যদের ক্ষমতায়নই করছে না, বরং জাতীয় উন্নয়ন ও টেকসই উত্তরণের ভিতকে আরও দৃঢ় করে তুলছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কর্তৃক মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ৮,১১৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া জেলা সমবায় কার্যালয়সমূহ এর প্রশিক্ষণ ইউনিট দ্বারা ২২,৮৩৩টি ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়েছে।

সমবায়ের একমাত্র ব্র্যান্ড ভিত্তিক দুগ্ধ সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু এডিশনে অবদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য সংখ্যা ৮৬টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৩.৪৩ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারীগণের ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে এবং যা জাতীয় সমবায় নীতি'র ৪.১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমবায় কার্যক্রমকে উৎপাদন পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখছে।

দারিদ্র্য হ্রাসে SDG ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় : জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goals (SDGs) – 2030 এর মূল ধারণা হচ্ছে Leave no one behind" এবং ৮নং লক্ষ্যমাত্রা 'সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন'। ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় সমবায় নীতি'র মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়কে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। সমবায়ভিত্তিক

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুধুমাত্র সদস্যদের ক্ষমতায়নই করছে না, বরং জাতীয় উন্নয়ন ও টেকসই উত্তরণের ভিতকে আরও দৃঢ় করে তুলছে।

আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সমবায় খাতকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সমবায় সমিতি নিবন্ধন, তদারকি, নিরীক্ষা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ীদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪,৯২০ জন উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২৪,৯১৪.৯৮ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান আবর্তক তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,১৫০ জন উপকারভোগীদের ১,১৩৫টি আয়বর্ধনমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত উপকারভোগীদের মাঝে ৬,৭৬৮ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান আবর্তক তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

'Marketing and Value chain development of Agricultural Products through Cooperatives' শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের সমবায়ভিত্তিক বাজারজাতকরণের সুযোগ যাচাই করা হবে।

এছাড়া নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা হিসেবে

- 'বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩,২০০ জন প্রান্তিক সুবিধাভোগীকে ২৩৩টি দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়ী উপকারভোগীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- 'দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ' প্রকল্পের আওতায় ২,৫০০ জন প্রান্তিক সুবিধাভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন গঠন, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মাসিক আয় বৃদ্ধি, স্থানীয় দারিদ্র্য হ্রাস ও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ২২৭টি দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উপকারভোগীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- নারীর ক্ষমতায়নে ১০,০০০ জন মহিলা উপকারভোগীদের জন্য 'সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন' প্রকল্পের আওতায় ১,৫১৬টি দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়ী উপকারভোগীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

  এছাড়া ২০,০০০ জন নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সম্পদ সৃজন ও ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখার জন্য 'উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ১,৫০৪টি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়ী উপকারভোগীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অংশ হিসেবে নৃতাত্ত্বিক এবং পিছিয়ে পড়া ৩,০০০ জন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে 'রাজশাহী বিভাগের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সমবায়ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃজন' প্রকল্পের আওতায় ২১৭টি দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়ী উপকারভোগীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আস্থা পান। তাই উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাবে ও নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাপক শিল্পায়ন হবে বলে আশা করা যায়। অনেক দেশের সঙ্গে নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারও উন্মুক্ত হবে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনকে মসৃণ রাখার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতারও বিকাশ ঘটবে।

তথ্য সূত্র

১. https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list
২. রুবেল, ম. মো., এলডিসি থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়, বণিক বার্তা (২২ মে, ২০২৫)
৩. https://www.bonikbarta.com/editorial/dMaZuIy5mIROOzZT

■ আইনিন নাঈম ফিমা : উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর,ঢাকা।

মিল্কভিটা: সমবায় অঙ্গনে

উজ্জ্বল নক্ষত্র

মুহাম্মদ মকবুল হোসেন

বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে সমবায় একটি সুপ্রাচীন এবং শক্তিশালী পদ্ধতির নাম। গ্রামীণ সমাজে মানুষ যুগে যুগে মিলেমিশে কাজ করেছে, পরস্পরের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছে টিকে থাকার পথ। সমবায়ের মূল দর্শন হলো একতা, সহযোগিতা, পারস্পরিক আস্থা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি। যখন একা কোনো ব্যক্তি বা পরিবার বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তখন সমাজের সম্মিলিত শক্তি একটি সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে তাদের সমৃদ্ধি এনে দেয়। বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দুগ্ধ খাতের সর্ববৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড, যা সাধারণভাবে মিল্কভিটা নামে পরিচিত। মিল্কভিটা বাংলাদেশের লাখ লাখ খামারি ও দুগ্ধ উৎপাদকের জীবন-জীবিকার সাথে সরাসরি যুক্ত জাতীয় অর্থনীতিতে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়ে সমবায়ভিত্তিক প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে পুরনো নাম সংশোধন

বর্তমানে মিল্কভিটার কার্যক্রম সারা দেশজুড়ে বিস্তৃত। মিল্কভিটার আওতায় দেশে মোট প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩৮৫৮টি। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,৪৩,১৯২ জন যারা প্রত্যক্ষভাবে মিল্কভিটার সাথে জড়িত।

করে প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয় ''ইষ্টার্ন মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ''। এ পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৯৬৮ সালে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক উক্ত কারখানাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপণের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক'এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সি ড্যানিডা'এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দুটির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দুটির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় "সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প" নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দুটি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে ''বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড'' নামকরণ করা হয়। দেশে সমবায় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য ছিল শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণি কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদেরকে সমবায়'এর মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ভিশন হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

বর্তমানে মিল্কভিটার কার্যক্রম সারা দেশজুড়ে বিস্তৃত। মিল্কভিটার আওতায় দেশে মোট প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩৮৫৮টি। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,৪৩,১৯২ জন যারা প্রত্যক্ষভাবে মিল্কভিটার সাথে জড়িত। এছাড়াও প্রায় সাড়ে ১০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। দেশের উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের প্রায় ৩৪৪৩টি গ্রামে দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রান্তিক খামারীদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নতজাতের গাভি পালনের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মিল্কভিটা তার সীমিত পরিসরের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। গত ১০ বছরে মিল্কভিটা কর্তৃক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুধের ন্যায্যমূল্য প্রদানসহ দেশের পুষ্টিচাহিদা নিরসনকল্পে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। সমবায় পদ্ধতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় কাঙ্ক্ষিত সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের সমৃদ্ধ দুগ্ধ এলাকার ১৫২টি উপজেলায় ৫৭টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিদিন তাদের উৎপাদিত দুধ কৃষকরা নিকটস্থ দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সেখানে দুধের গুণগত মান পরীক্ষার পর তা হিমায়িত ট্যাঙ্কারে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর এই দুধ ঢাকা, বাঘাবাড়িঘাট এবং টেকেরহাট দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রেরণ করা হয়। সেখানে দুধ পাস্তুরিত করার পর বিভিন্ন প্যাকেজে বাজারজাত করা হয়। এছাড়াও মিল্কভিটা মাখন, ননীযুক্ত গুড়োঁদুধ, ননীবিহীন গুড়োঁদুধ, রসগোল্লা, কাঁচা সন্দেশ, প্যারা সন্দেশ, চকোলেট, লাবাং, মাঠা, পনির, মিষ্টি দধি , টক দধি, বিস্কুট, কেক, রসমালাই, ঘি, খেজুরের গুড়ের সন্দেশ, ললিজ নানা দুধজাত পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাত করে থাকে।

মিল্কভিটার কার্যক্রম শুধু দুধ প্রক্রিয়াকরণেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণেও কাজ

মিল্কভিটার কার্যক্রম নারী উন্নয়নেও সহায়ক। দেশের বহু গ্রামে নারী সদস্যরা দুগ্ধ উৎপাদন ও সংগ্রহে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। তারা গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। এতে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ছে, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি সমবায়ভিত্তিক কাঠামোর কারণে লাভের একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে। এছাড়া সমবায়ী কৃষকদের গবাদিপশুর নিয়মিত টিকা প্রদান, অসুস্থ গবাদি পশুর চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ, উন্নতমানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সী বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন, উচ্চফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ প্রদান, মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে গাভি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান, উন্নতমানের দানাদার গোখাদ্য প্রকৃতমূল্যে সরবরাহ, গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য প্রশিক্ষণ, পশুপালনের আধুনিক কৌশল শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং খামার উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়। পশু চিকিৎসক ও প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে কৃষকদের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল শেখানো হয়, উন্নত জাতের গাভি সরবরাহ করা হয়। ফলে কৃষকরা আরও বেশি দুধ উৎপাদন করতে সক্ষম হন এবং তাদের জীবনমান উন্নত হয়।

দেশের নানা প্রান্তিক সমবায়ী খামারীদের সহায়তাসহ মিল্কভিটার সেবা কার্যক্রম বিস্তৃত করার জন্য সময়োপযোগী নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- সিরাজগঞ্জ জেলার লাহিড়ীমোহনপুরে "দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরে ও মাদারীপুর জেলার টেকেরহাটে "দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ফরিদপুর জেলার চরাঞ্চলের উৎপাদিত দুধের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর দুধের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে "বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প" এর আওতায় গাভি ঋণ প্রদান, চিলিং প্লান্ট স্থাপন ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক বাস্তবায়িত হয়েছে।

মিল্কভিটার মালিকানাধীন প্রায় ১০৭০ একর বাথানভূমি সমবায়ীদের মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই বাথানভূমি আগে সীমিতভাবে ব্যবহৃত হলেও এখন সমবায় সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র খামারীরা প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হচ্ছে। ভূমি প্রাপ্ত সমবায় সদস্যরা নিজেদের গবাদিপশু পালন করে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করছে এবং অতিরিক্ত দুধ মিল্কভিটাতে সরবরাহ করছে। ফলে তারা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকের জমির মালিকানা না থাকলেও এই ভূমিতে কার্যকরভাবে পশুপালনের সুযোগ পাচ্ছে, যা তাদের জীবিকা নির্বাহ ও আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করছে। পাশাপাশি সমবায়ের মাধ্যমে তারা প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা ও বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা পাচ্ছে। এই উদ্যোগ শুধু ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় বরং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ফলে মিল্কভিটার বাথানভূমি বণ্টন সমবায়ভিত্তিক টেকসই উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতিবছর বাংলাদেশে সমবায় দিবস পালিত হয়। সময় ও সমাজের চাহিদার আলোকে প্রতিবছরই এর প্রতিপাদ্য পরিবর্তন করা হয়। ২০২৫ সালে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়"। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চেতনার মধ্যেই ছিল সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আজও দারিদ্র্য, বৈষম্য, বেকারত্ব, লিঙ্গবৈষম্য এবং সামাজিক বৈষম্য পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি। সমবায় কাঠামোই পারে এই সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান দিতে। কারণ সমবায়ে এককভাবে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, শহর-গ্রাম সব মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করায়। সমবায়ের মাধ্যমে একজন কৃষক যেমন তার দুধের ন্যায্যমূল্য পান, তেমনি একজন ভোক্তাও সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন খাদ্য পান। প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ দরিদ্র কৃষককে শহরের বড় বাজারের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। একজন খামারি যদি দিনে দুই লিটার দুধও উৎপাদন করেন তবে সেটি মিল্কভিটার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র কৃষকও জাতীয় অর্থনীতির অংশীদার হয়ে ওঠে। এভাবে সমবায় নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়। বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যেমন অর্থনীতিতে অবদান রাখেন, তেমনি ক্ষুদ্র খামারির অবদানও গুরুত্ব পায়। এটি আসলেই সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি মডেল।

মিল্কভিটার কার্যক্রম নারী উন্নয়নেও সহায়ক। দেশের বহু গ্রামে নারী সদস্যরা দুগ্ধ উৎপাদন ও সংগ্রহে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। তারা গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। এতে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ছে, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন দেশের

সার্বিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে। সমবায় কাঠামো নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনতে সহায়তা করছে। মিল্কভিটার কার্যক্রম কেবল দুধ উৎপাদন বা পণ্য বিপণন নয়; বরং এটি একটি সামাজিক আন্দোলন, যা সাম্য, ন্যায়বিচার ও সমতায় বিশ্বাস করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রমাণ করেছে যে সমবায়ের শক্তি কাজে লাগালে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয়, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং বৈষম্য কমে আসে।

মিল্কভিটার সামনে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। দুধ সংগ্রহে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, কারখানার আধুনিকায়নের প্রয়োজন, বাজারে ভেজাল দুধ ও প্রতিযোগিতামূলক কোম্পানির আধিপত্য এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। একইসাথে কৃষকদের আরও বেশি সহযোগিতা, সুলভ মূল্যে গবাদিপশুর খাদ্য সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন জরুরি। এছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ১০ লক্ষাধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ীর বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হিসেবে দুগ্ধ শিল্পকে অগ্রাধিকার (বিশেষ) খাত হিসেবে ঘোষণা করাও এখন সময়ের দাবি। এসব বাধা অতিক্রম করে মিল্কভিটা যদি সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম আরও প্রসারিত করতে পারে, তবে "সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়" এই প্রতিপাদ্য বাস্তবে রূপ নেবে।

সাম্য ও সমতা কোনো কল্পনার বিষয় নয়। এটি বাস্তবায়ন সম্ভব যদি সমাজের প্রতিটি মানুষকে উন্নয়নের অংশীদার করা হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় আন্দোলন একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এই ধারার অন্যতম সফল উদাহরণ হলো বাংলাদেশ মিল্কভিটা। এটি মূলত দুগ্ধ উৎপাদক সমবায়ীদের নিয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রির সুযোগ পায় মিল্কভিটার মাধ্যমে। ফলে তারা ন্যায্য আয়ের নিশ্চয়তা

সেতু বন্ধন চিত্রঃ

লাভ করে। একই সঙ্গে দুধ প্রক্রিয়াজাত করে শহরে সরবরাহ করায় দেশের সাধারণ মানুষও উপকৃত হয়। মিল্কভিটার কার্যক্রমের ফলে গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদক পরিবারগুলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পাচ্ছে। আগে যারা দুধ বিক্রি করতে গিয়ে ঠকত বা সঠিক বাজারমূল্য পেত না তারা এখন সমবায়ের মাধ্যমে স্থায়ী ক্রেতা ও ন্যায্য দাম পাচ্ছে। এর ফলে তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে, সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা যাচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরাও দুধ উৎপাদন ও সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে। অতএব বলা যায়, মিল্কভিটা শুধু একটি দুগ্ধ সমবায় নয়, এটি বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমবায়ের দর্শনই সেই সুযোগ সৃষ্টি করে। আজকের বিশ্বে যেখানে ধনী-গরিবের বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে, সেখানে সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতি এক নতুন দিশা দেখায়। মিল্কভিটা সেই দিশার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা দেখিয়ে দিয়েছে সহযোগিতা, একতা ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান কেবল অর্থনৈতিক লাভই নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যও প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মিল্কভিটার কার্যক্রম কেবল একটি অর্থনৈতিক প্রকল্প নয় বরং এটি বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের প্রতীক। সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়" বাস্তবায়নের পথে মিল্কভিটার যাত্রা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। এটি কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়, ভোক্তাকে নিরাপদ পণ্য দেয়, নারীকে ক্ষমতায়িত করে, গ্রামীণ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে এবং জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। একদিন বাংলাদেশে বৈষম্যহীন, সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মিল্কভিটার মতো সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো হবে প্রধান চালিকাশক্তি। সমবায়ের শক্তিতে গড়ে উঠবে ন্যায়ভিত্তিক একটি দেশ, যেখানে থাকবে না শোষণ, বৈষম্য বা অবহেলা। আর এভাবেই প্রতিপাদ্যের সত্যতা বাস্তবে রূপ নেবে।

■ মুহাম্মদ মকবুল হোসেন : ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মিল্কভিটা

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও সমবায়সমূহে তার প্রয়োগ

সৈয়দ জসীম উদ্দিন

বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুদভিত্তিক ও ভোগবাদী অর্থনীতির প্রভাবে ক্রমেই মানুষের উপর শোষণ বৃদ্ধি করছে। আয়ের বৈষম্য, দারিদ্র্য, ঋণের ফাঁদ এবং সামাজিক অস্থিরতা বিশ্ববাসীর জন্য এক অনিবার্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ধনীকে আরও ধনী করছে, আর গরিবকে ফেলে দিচ্ছে আরও দুর্বল অবস্থায়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যক্তি উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ করে অর্থনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থনীতি একটি বিকল্প ন্যায়সঙ্গত, মানবিক ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করেছে। এই প্রবন্ধে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক নীতি, সুদ ও অন্যান্য নিষিদ্ধ উপাদানের প্রভাব, সমবায়ে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ, বাংলাদেশে এর বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা করা হবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা যার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হয় পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। কেবলমাত্র ইহজাগতিক কল্যাণ সাধনই নয় ইহজগত ও পরজগতের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

ইসলামী আকিদা অনুযায়ী পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মানুষ কোন সম্পদের স্রষ্টাও নয় মালিকও নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন: ''আকাশ ও যমিনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট'' (সুরা শুরা, আয়াত ৪৯)

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, মানুষ শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: ''তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তোমাদের যে ধন-সম্পদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন তা হতে ব্যয় ও ব্যবহার কর''(সুরা হাদিদ, আয়াত ০৭)

যেহেতু মানুষ সম্পদের প্রতিনিধি মাত্র সেহেতু মালিকের নির্ধারিত পদ্ধতি ও নিয়মনীতি উপেক্ষা করে তা অর্জন বা ব্যয় করার কোন সুযোগ নেই। এ জন্য অর্থ আয় ও তা খরচ করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি মালিক দিয়ে দিয়েছেন এবং তার মধ্যেই প্রকৃত কল্যান নিহিত রয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ অর্জনের নিষিদ্ধ পথ

অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচলিত সকল পদ্ধতি ইসলামসম্মত নয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময়, প্রবন্ধ, বই প্রকাশ সহ ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এ সকল গবেষণার মাধ্যমে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় হতে ৩টি শরীয়াহবিরোধী উপাদান বের করা হয়েছে। উপাদানগুলো হলো ১.রিবা বা সুদ ২.মাইসির বা জুয়া এবং ৩. গারার বা প্রতারণা।

সুদ বা রিবা

সুদ শব্দটি উর্দূ বা ফারসী ভাষা থেকে উদ্ভুত, এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Interest বা Usury আর আরবী প্রতিশব্দ হলো রিবা।

সুদ সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে ভয় কর আর সুদের যা বকেয়া আছে তা পরিহার কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর অর্থাৎ সুদ পরিহার না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (সুরা বাকারা, আয়াত ২৭৮-২৭৯)

মাইসির বা জুয়া

মাইসির বা জুয়া হলো এমন এক ধরনের খেলা যেখানে দুটি পক্ষ থাকে, উভয় পক্ষই লাভের আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে কিন্তু লাভবান হয় একপক্ষ আর অপরপক্ষ তাঁর সমুদয় পুঁজি হারান। এ খেলা বা এ ধরনের কার্যক্রমকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "হে মুমিনগণ!

হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধনসম্পদ ভক্ষণ করো না। যদি তা ব্যবসায় এবং পারস্পারিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয় তবে তা দোষণীয় নয়।

নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।" (সুরা মায়েদাহ, আয়াত ৯০)

মাইসির বা জুয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই পুঁজি বিনিয়োগ করে কিন্তু লাভবান হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ। আর বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারী সম্পূর্ণরূপে তাঁদের পুঁজি হারায়।

গারার বা প্রতারণা

গারার এর বাংলা অর্থ হলো প্রতারণা, যা লেনদেনের ক্ষেত্রে কপটতা, ধোঁকা, অস্পষ্টতা, মিথ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধনসম্পদ ভক্ষণ করো না। যদি তা ব্যবসায় এবং পারস্পারিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয় তবে তা দোষণীয় নয়।'' সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯

সমবায়ে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ

শেয়ার মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি:

মুশারাকা: ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো "মুশারাকা"। মুশারাকা আরবি শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ 'ভাগাভাগি'। এর মূল শব্দ হল শিরাকা, যার অর্থ "অংশীদার হওয়া"।

মুশারাকার বৈশিষ্ট্যসমূহ

- অংশীদারিত্ব: প্রত্যেক অংশীদার একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মূলধন বা সম্পদ সরবরাহ করে।
- লাভ-ক্ষতির বণ্টন: লাভ/ক্ষতি মূলধনের অনুপাতে ভাগ হয়।
- সমান অধিকার: সকল অংশীদার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অধিকার রাখে।
- মুশারাকা এ বৈশিষ্ট্যের সমবায় সমিতি শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন গঠন করতে পারে।

সঞ্চয় আমানত গ্রহণের পদ্ধতি

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আমানত গ্রহণের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত দুটো পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করতে পারে:

১.ওয়াদিয়া

ওয়াদিয়া অর্থ হলো নিরাপদ সংরক্ষণ বা গচ্ছিত সম্পদ। ইসলামি সমবায়সমূহ সুদভিত্তিক চলতি হিসাবের বিকল্প আল ওয়াদিয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে।

ওয়াদিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ

- নিরাপত্তা: জমাকারীর প্রাথমিক লক্ষ্য অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ।
- অর্থ ব্যবহারের অনুমতি: অর্থ ব্যবহারের জন্য জমাকারীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় উক্ত অর্থ ব্যবহার করা বৈধ হবেনা।
- লাভ/ক্ষতিতে অংশগ্রহণ: আমানত–কারীগণ জমাকৃত অর্থ থেকে চাহিদা অনুযায়ী যে কোন পরিমাণ অর্থ তোলার অধিকার ভোগ করেন। জমাকারী সমবায় সমিতির কাছ থেকে কোন মুনাফা পান না বা ক্ষতির ভাগ বহন করেন না।
- সার্ভিস চার্জ গ্রহণ: জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হেফাযত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে জমাকারীর কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারে।

মুদারাবা

মুদারাবা হলো শরী'য়াহ সম্মত যৌথভাবে ব্যবসা করার একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ব্যবসায়ে এক পক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে অন্য পক্ষ ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ অংশীদারদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগাভাগি হয় এবং ব্যবসায়ে লোকসান হলে পুঁজির মালিক আর্থিক মূলধনের ক্ষতি পুরোপুরি বহন করে আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাঁর মেধা, শ্রম ও আনুসঙ্গিক বিষয়ের ক্ষতি বহন করে। সমবায় সমিতি সাধারণ সঞ্চয় আমানত ও বিভিন্ন মেয়াদী জমা মুদারাবা পদ্ধতিতে গ্রহণ করে।

মুদারাবা আমানতের মূল বৈশিষ্ট্য

- অংশীদারিত্ব: এটি একটি চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। এখানে এক পক্ষ (সাহিবুল মাল) শুধু পুঁজি সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ (মুদারিব) ব্যবসার জন্য তার শ্রম, দক্ষতা ও মেধা বিনিয়োগ করে।
- লাভ বন্টন: ব্যবসার লাভ পূর্ব-নির্ধারিত একটি অনুপাতে (শেয়ারিং রেশিও বা Income Sharing Ratio - ISR) দুই

পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়।

- ক্ষতির বন্টন: যদি ব্যবসায় লোকসান হয়, তবে সম্পূর্ণ লোকসান বহন করেন মূলধন সরবরাহকারী (সাহিবুল মাল)। ব্যবস্থাপক বা মুদারিবের কোনো ক্ষতি হয় না, শুধু তার শ্রম ও মেধার বিনিয়োগ ব্যর্থ হয়।

বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় সকল প্রকার বিনিয়োগ সুদভিত্তিক। অপরদিকে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করে আসছে। ইসলামী শরী'য়াহতে অনেকগুলো বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায় প্রতিষ্ঠানে যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশী কার্যকর হতে পরে তা হলো:

মুরাবাহা

মুরাবাহা হলো ইসলামিক অর্থব্যবস্থায় ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি, যেখানে ক্রেতার জন্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান পণ্য কিনে নির্দিষ্ট লাভসহ বিক্রি করে। এটি একটি খোলা বাণিজ্য চুক্তি, যেখানে ক্রেতা আগে থেকেই জানে বিক্রয়মূল্য এবং বিনিয়োগকারীর লাভ কত হবে।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যাংকিং মুরাবাহা প্র্যাক্টিস হচ্ছে। ইসলামী সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ বিনিয়োগ পদ্ধতি মুরাবাহার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে।

ধাপসমূহ:

- সমিতির সদস্য সমবায়কে জানায় যে, সে একটি নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করতে চায়।
- সমবায় পণ্যটি ক্রয় করে এবং নিজের অধিকারে নেয়।
- সমবায় পণ্যটি সদস্যের কাছে একটি চুক্তি সাপেক্ষে পূর্বনির্ধারিত লাভে বিক্রি করে।
- সদস্য পুরো মূল্য এককালীন বা কিস্তিতে পরিশোধ করে।

মুরাবাহার প্রধান সুবিধাসমূহ

- সুদমুক্ত লেনদেন: ইসলামে সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ। মুরাবাহার মাধ্যমে সুদের পরিবর্তে বৈধভাবে লাভ অর্জন করা সম্ভব।
- পণ্যের মালিকানার ভিত্তিতে লেনদেন: প্রতিষ্ঠান নিজে পণ্য ক্রয় করে পরে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে, ফলে প্রকৃত মালিকানা ও ঝুঁকি ভাগাভাগি হয়।
- লাভের স্বচ্ছতা: প্রতিষ্ঠান কত মূল্যে পণ্য কিনেছে ও কত লাভ যোগ করেছে তা গ্রাহক জানে। এতে গোপনীয়তা বা প্রতারণার সুযোগ কমে।
- ঝুঁকি কমানো: ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে পণ্য বিক্রির কারণে সমবায় সমিতি ও গ্রাহক উভয়ের ঝুঁকি কমে যায়।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়ক: উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী মূলধনের চাপ ছাড়াই কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারে।
- নৈতিক ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা: ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক হওয়ায় এটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়।

হায়ার বা ইজারা

ইজারা মূলত ভাড়াভিত্তিক একটি আর্থিক লেনদেন। এই চুক্তির মাধ্যমে সমবায় একটি সম্পদ বা যন্ত্রপাতি গ্রাহকের জন্য কিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেটি ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেয়। ইজারার ক্ষেত্রে গ্রাহক সম্পদের মালিক হন না; বরং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এর ব্যবহারের অধিকার পান।

ইজারার ধাপসমূহ:

- গ্রাহকের আবেদন ও প্রয়োজন নির্ধারণ: গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে জানায় যে সে কোন সম্পদ (যেমন মেশিন, গাড়ি, জমি বা ভবন) ইজারা নিতে চায়।
- সম্পদ নির্বাচন ও ক্রয়: প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ নির্বাচন করে। মালিকানা প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠান সম্পদ ক্রয় করে।
- চুক্তি সম্পাদন: নির্দিষ্ট সময়, ভাড়া, শর্তাবলি, রক্ষণাবেক্ষণ দায়, ক্ষতি-ক্ষতির দায়িত্ব ইত্যাদি উল্লেখ করে লিখিত চুক্তি সম্পন্ন হয়।এখানে ভাড়ার পরিমাণ ও পরিশোধ পদ্ধতি স্পষ্ট থাকতে হয়।
- সম্পদের হস্তান্তর (Usufruct) প্রদান: চুক্তি সম্পাদনের পর প্রতিষ্ঠান সম্পদটি গ্রাহকের কাছে ব্যবহার করার জন্য হস্তান্তর করে।মালিকানা থাকে সমবায় প্রতিষ্টানের কাছে, কিন্তু ভোগ/ব্যবহারাধিকার থাকে গ্রাহকের কাছে।
- ভাড়া প্রদান: গ্রাহক নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ভাড়া (Rental) প্রদান করে। এটি কিস্তি বা নির্দিষ্ট সময়ে হতে পারে।
- রক্ষণাবেক্ষণ ও ঝুঁকি ভাগাভাগি: ক্ষুদ্র/দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ গ্রাহক বহন করে।বড় ধরনের মেরামত বা মালিকানাজনিত খরচ সমবায় বহন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অপ্রত্যাশিত ক্ষতির মূল ঝুঁকি মালিকের উপর থাকে।
- ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়া: মেয়াদ শেষে গ্রাহক সম্পদ ফেরত দেয়, অথবা নতুন শর্তে ইজারা নবায়ন করে। কখনও কখনও ইজারা ও ইজারা-মুনতাহিয়া বিট-তামলিক (Ijara Muntahia Bittamlik) পদ্ধতিতে মেয়াদ শেষে মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গ) হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচপিএসএম)

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক বিনিয়োগ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত। পদ্ধতি তিনটি হলো ১. হায়ার বা ইজারা ২. পারচেজ বা বাই ৩. শিরকাতুল মিলক। তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে হওয়ার কারণে কেউ কেউ এ পদ্ধতিকে হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতিও বলে থাকেন। এ বিনিয়োগে ইজারা বা ভাড়াটিই মূলত মূখ্য বিষয়।

এ পদ্ধতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক কোন সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হয় গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সম্পদে প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এরপর প্রতিষ্ঠান তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের নিকট ভাড়া দেয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে।

HPSM-এর ধাপসমূহ

- গ্রাহকের আবেদন: গ্রাহক সমবায়ের কাছে আবেদন করে জানায় যে সে নির্দিষ্ট কোনো সম্পদ (যেমন বাড়ি, গাড়ি, মেশিন ইত্যাদি) ক্রয় করতে চায়।
- যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা (Shirkatul Milk): সমবায় ও গ্রাহক যৌথভাবে সম্পদটি ক্রয় করে।উভয়ে নির্দিষ্ট অংশীদার হয় (যেমন ৭০% সমবায় + ৩০% গ্রাহক)।
- ব্যবহার চুক্তি (Ijara/Lease Agreement): গ্রাহক সমবায় সমিতির অংশ ব্যবহার করার জন্য ভাড়া প্রদান করে। সমবায় সমিতির অংশীদারিত্বের অনুপাতে ভাড়া নির্ধারিত হয়।
- কিস্তিতে ক্রয় (Hire Purchase Agreement): গ্রাহক ধীরে ধীরে সমবায়ের অংশ কিস্তিতে কিনে নেয়।প্রতিটি কিস্তির পর সমবায়ের মালিকানা অংশ কমতে থাকে, গ্রাহকের অংশ বাড়তে থাকে।
- মালিকানা হস্তান্তর: নির্ধারিত কিস্তি ও ভাড়া সম্পূর্ণ পরিশোধ হলে সমবায় সমিতির অংশ পুরোপুরি গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর হয়। তখন গ্রাহক ১০০% মালিক হয়ে যায়।

বাই সালাম

বাই সালামের শাব্দিক অর্থ হলো অগ্রিম ক্রয়। চুক্তির সময় পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বা অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বাই সালাম বা বাই সালাফ বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করতে পারে।

বাই সালামের ধাপসমূহ

- আবেদন ও প্রস্তাব: ক্রেতা (সমবায়) ও বিক্রেতা (কৃষক/উৎপাদক) সালাম চুক্তির জন্য আলোচনা করে।পণ্যের ধরন, পরিমাণ, মান, ডেলিভারি সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়।
- চুক্তি সম্পাদন: শরিয়াহ অনুযায়ী লিখিত চুক্তি করা হয়।এখানে অবশ্যই পণ্যের বৈশিষ্ট্য, পরিমাণ, গুণমান, সরবরাহের তারিখ ও স্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- অগ্রিম মূল্য পরিশোধ: ক্রেতা (সমবায়) চুক্তি সম্পাদনের সময়ই পুরো মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে। এটি সালামের মূল শর্ত।
- পণ্য উৎপাদন/প্রস্তুতি: বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করে। এতে তার প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সুযোগ হয়।
- সরবরাহ (Delivery): নির্দিষ্ট তারিখ ও স্থানে বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করে। সরবরাহকৃত পণ্য অবশ্যই চুক্তিতে বর্ণিত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী হতে হবে।
- পণ্য গ্রহণ ও নিষ্পত্তি: ক্রেতা (সমবায়) পণ্য গ্রহণ করে এবং সালাম চুক্তি সমাপ্ত হয়।পরে সমবায় প্রতিষ্ঠান চাইলে বাজারে বিক্রি করে লাভ অর্জন করে।

বাই ইসতিসনা

বাই-ইসতিসনা অনেকটা বাই-সালামের মতোই। এ অর্থে যে, এখানেও সাধারণত মূল্য আগে পরিশোধ করা হয় আর পণ্য পরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তবে বাই-ইসতিসনা এমন পণ্যের ক্ষেত্রে করা হয়, যা একটি নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলে আসে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্যের কাঁচামাল সরবরাহ করে ও নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আধুনিক ইসলামি অর্থনীতিতে নানা রকম মেশিনারিজ ও মেশিনে তৈরি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাই-ইসতিসনা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সমবায় সমিতিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ

১. ইসলামী অর্থব্যবস্থার জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবল স্বল্পতা।
২. প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থার প্রভাব।
৩. ইসলামী ব্যাংকি এর উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকলেও সমবায় সমিতিতে এ ব্যবস্থার প্রয়োগে নীতিমালার অভাব রয়েছে।
৪. সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি।

সমবায় সমিতিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা জনপ্রিয় করার উপায়

১. ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কর্মসূচি বৃদ্ধি করা।
২. সমবায়ে শরীয়াহ বোর্ড গঠন করা।
৩. সরকারিভাবে ইসলামী সমবায়কে নীতি ও আইনগত সহায়তা প্রদান।
৪. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ইসলামী বিনিয়োগের আওতায় আনা।

উপসংহার

ইসলামী অর্থব্যবস্থা আধুনিক যুগে একটি কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমবায় একটি গণমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে ইসলামী অর্থনীতি সহজেই প্রয়োগ করা সম্ভব। সুদ, জুয়া ও প্রতারণামুক্ত ইসলামী সমবায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিও দান করতে পারে।

অতএব, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতিগুলোকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার নীতিমালায় পরিচালিত করা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। অনেক সমবায় সমিতির ইসলামী বিভিন্ন ডিপোজিট গ্রহণ বা বিনিয়োগ প্রদানের আগ্রহ থাকলেও ভাল ধারণার অভাবে বাস্তব অর্থে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা শতভাগ অনুসরণ করেনা। আশা করা যায় সমবায় সমিতিতে সঠিকভাবে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি অনুসরণ করা হলে তা জনপ্রিয় হবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

■ সৈয়দ জসীম উদ্দিন, এমবিএ (ফাইন্যান্স), পিজিডি (ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স), জেলা সমবায় অফিসার, খুলনা।

যশোরের ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির ‘গাছি বাড়ি’

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

যশোর এর যশ খেজুরের রস। কথায় আছে- নানান রঙের ফুলের মেলা, খেজুর গুড়ের যশোর জেলা। খেজুর গুড়ের জন্য যশোর জেলা বিখ্যাত। পাশাপাশি ফুলের রাজ্যখ্যাত গদখালি এই যশোর জেলায় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে গাছিরা ও ফুল চাষিরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না, যেটা তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে বাঁধা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে যশোর জেলার ঐতিহ্যবাহী পণ্যের বিস্তৃতি এবং গাছি ও ফুল চাষিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বেডস) এবং জাপান এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন ফোরাম (জীফ)-এর উদ্যোগে একটি জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় চাষিদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যবাহী পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত মোট ১৩৫ জন (গাছি, ফুল চাষি এবং হস্তশিল্পী) সদস্য নিয়ে "যশোর জেলার ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ" গঠিত হয়েছে। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাপানি এনজিও অনুদান সহায়ক প্রকল্পের অর্থায়নে একটি অফিস ভবন স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত অফিসটি সর্বত্র "গাছি বাড়ি" নামে পরিচিতি পাচ্ছে।

গাছি বাড়ি একটি কেন্দ্রীয় স্থান, যেখান থেকে সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি একটি বহুমুখী কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। যেখানে রয়েছে- গুড় উৎপাদন কেন্দ্র, মোড়কীকরণ সুবিধার জন্য সুবিশাল ঘর, সমবায় পণ্য বিক্রির জন্য এগ্রো গ্রীনশপ নামে একটি

বিক্রয় ও পণ্য পরিদর্শনের কেন্দ্র, সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুবিশাল অফিস কক্ষ, সদস্যদের সভা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কনফারেন্স রুম, উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য একটি পরীক্ষাগার, সমবায়ভিত্তিক খেজুর চারার নার্সারি, দর্শনার্থীদের জন্য নির্মাণাধীন রয়েছে মনোরম কটেজ।

এ প্রকল্পের আওতায় সমবায় সমিতি সদস্যরা সমিতি পরিচালনার উদ্দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সাংগঠনিক ক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সমবায় ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক সমবায় অফিস ও যশোর জেলা সমবায় কর্মকর্তার মাধ্যমে তারা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সাংগঠনিক ক্ষমতার উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে সদস্যরা নিজেদের মিটিং এবং কর্মসভা নিজেরাই পরিচালনা করে থাকেন।

এছাড়া সমবায় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, বৈচিত্র্যময় পণ্যের, মোড়কীকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে নানাবিধ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: খেজুর রস সংগ্রহকারীদের- খেজুর গুড় ও গুড়জাত পণ্য প্রস্তুতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, এবং খেজুর গুড়ের মোড়কীকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়া ফুল চাষিদের- মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, জৈব পদ্ধতিতে ফুলের চাষ, ফুলের মোড়কীকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি, হস্তশিল্পীদের- বৈচিত্র্যময় পণ্যের উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায় সমিতির সকল সদস্যরা পূর্বের তুলনায় তাদের পণ্যের গুণগতমান, মোড়কীকরণ ও বাজারজাতকরণ মান উন্নত করতে সক্ষম হন। বর্তমানে তারা তাদের উৎপাদিত সমবায় পণ্য ব্র্যান্ড হিসাবে বাজারে বিপণন করছেন।

সমবায় সদস্যরা বর্তমানে নিজেদের পণ্যের উৎপাদন, মোড়কীকরণ, প্রচার-প্রচারণা, বাজারজাতকরণ নিজেরাই করে থাকেন। এতে করে একদিকে যেমন তাদের সমবায় পণ্য সর্বত্র ব্র্যান্ড হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে, অন্যদিকে মধ্যস্বত্বভোগীদের ব্যতিরেকে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য সরাসরি নিজেরাই পাচ্ছেন। পাশাপাশি সদস্যরা সমবায়ভিত্তিক জৈব ফুল বাজার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া সমবায় পণ্য খেজুর গুড় বর্তমানে গাছি গুড় নামে বাজারে ব্যাপক পরিচিতি পাচ্ছে। তাদের উৎপাদিত এসকল পণ্যের প্রচার প্রসারতা ঘটাতে প্রকল্পের সহায়তায় সমবায় সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, পোস্টার তৈরি করেছেন। এবং পণ্যের প্রচারণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন ও মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ ধরনের কার্যক্রম তাদের সমবায় পণ্যের বিস্তার ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এ সমিতির উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে রয়েছে খেজুর গুড় (যেটা গাছি গুড় নামে পরিচিত), খেজুরের পাটালি, গুড়ের মোয়া, খেজুর গুড়ের বাদাম পাটালি সহ খেজুর গুড়ের তৈরি আরও বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত পণ্যের পাশাপাশি গদখালি এলাকায় সমবায় পণ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল ফুলের পণ্যসমূহ।

যেমনঃ ফুলের তৈরি সুগন্ধি তেল, ফুলের সাবান, ফুলের ডাই দিয়ে তৈরি জামা এবং শাড়ি। এছাড়া আরো আছে রেসিন ও প্রাকৃতিক ফুলের সংমিশ্রণে তৈরিকৃত চাবির রিং, কানের দুল, চিরুনি, চুড়ি, ওয়েট পেপার ইত্যাদি। এর পাশাপাশি সদস্যরা খেজুর পাতা দিয়ে নানাবিধ উপকরণ তৈরি করে থাকে। উৎপাদিত এসকল পণ্য তারা সরাসরি দোকানে এবং ক্রেতার কাছে বেশি দামে বিক্রি করে থাকেন। যা সমবায়ীদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সমবায় পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সদস্যরা ফুলের উপজাত পণ্যের (ফুল ও তেলের) পরীক্ষা করিয়েছেন। উক্ত পরীক্ষাটি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীকৃত। যা ক্রেতার সন্তুষ্টি ও পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে ও বাজারজাতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সমবায় সদস্যরা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দল সভা, ছোট সভা, এলাকাভিত্তিক সভা এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা পরিচালনা করে থাকে। এতে একদিকে যেমন সদস্যদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক দৃঢ় হয়। এধরনের কর্মকান্ড সমবায় সমিতির জন্য ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

এছাড়া সমবায় সদস্যরা বিকল্প আয়ের কথা বিবেচনা করে সমবায়ভিত্তিক খেজুর চারার নার্সারি এবং ফুলের নার্সারি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই নার্সারির প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যরা প্রকল্পের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের লিফলেট তৈরি করে তা সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে তাদের তৈরিকৃত নার্সারি থেকে চারা বিক্রির হার পেয়েছে।

এই নার্সারি থেকে চারা বিক্রির মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যরা বিকল্প আয় করতে পারছেন। যা তাদের জীবনযাত্রার মানকে আরো উন্নত ও গতিশীল করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সমবায়ভিত্তিক জৈব পদ্ধতিতে ফুল চাষের উদ্দেশ্যে সদস্যরা বর্তমানে ভার্মি উৎপাদন শুরু করেছেন। এর ফলে তাদের উৎপাদিত ফুলের ইনপুট খরচ পূর্বের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে এবং ফুল উৎপাদন বেড়ে গেছে। সদস্যরা ফুলের বাগানের পাশাপাশি সমন্বিত সবজি চাষ করছে। এতে একদিকে যেমন তাদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি হচ্ছে।

গদখালিতে সমবায় সদস্য কর্তৃক কৃষি পর্যটনের সূচনা করা হয়। যেখানে সদস্যরা নিজ ফুল বাগানে সমবায়ভিত্তিক কৃষি পর্যটন পরিচালনা করে থাকে। এই উদ্ভাবনার মধ্যে রয়েছে দর্শনার্থীদেরকে পরিবেশ সংরক্ষণ করার সঠিক জ্ঞান বিনিময়, বাগানে উৎপাদিত ফুলের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা করা, ফুলের উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করা এবং ছবি তোলার সুব্যবস্থা। এ ধরনের নতুন উদ্ভাবনা সমবায় সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সমবায় সমিতির সদস্যদের একটি সংগঠিত পরিচয় তৈরি করার পাশাপাশি সমিতির যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করা, পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও পরিচিতি বৃদ্ধি করা, পণ্যের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা, পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা, পর্যটক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিতি বৃদ্ধি করা, স্থানীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে ভূমিকা রাখা এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

যশোর জেলার গাছি ও ফুল চাষিদের জীবনমান উন্নয়নে একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করছে এ জেলার ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এবং তাদের এই গাছি বাড়ি। এটি শুধুমাত্র একটি সংগঠন এবং স্থাপনা নয়, বরং একটি সমন্বিত কেন্দ্র যা ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদন, বিপণন এবং সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। পরিশেষে বলাবাহুল্য যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম শুধুমাত্র সমবায় সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নেই নয়, বরং বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণে এবং টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সমবায় শক্তি, সমবায়ই মুক্তি

■ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান: জেলা সমবায় কর্মকর্তা যশোর।

তথ্যসূত্র

১. যশোর জেলার ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড
২. বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বেডস)
৩. জাপান এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন ফোরাম (জীফ)

চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা

মোঃ রনি মিয়া

চা বাংলাদেশের মানুষের প্রতিদিনের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। একসময় চা এ দেশের দ্বিতীয় রপ্তানিকারক পণ্য হলেও এখন দেশের জনগণই চায়ের প্রধান ভোক্তা। অল্পবিস্তর রপ্তানিও হয় বটে। মালনীছড়া চা বাগান বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের বৃহত্তম ও সর্বপ্রথম চা বাগান যা সিলেট জেলায় অবস্থিত। ১৮৫৪ সালে লর্ড হার্ডসন ১,৫০০ একর জায়গার উপর এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সিলেটের চা বাগানের সবুজ মায়ায় প্রতিদিন জড়ো হন হাজার হাজার দেশি বিদেশি পর্যটক। দেশের মোট চায়ের ৯০ শতাংশই উৎপন্ন হয় সিলেটে। এজন্য সিলেটকে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশও বলা হয়ে থাকে। সিলেট বিভাগে চায়ের চাষ প্রথম শুরু হলেও বর্তমানে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। তেলিয়াপাড়া চা বাগান বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় অবস্থিত একটি চা বাগান। বর্তমানে অধিকাংশ বাগানই বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে।

আজকে আমরা কথা বলবো হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান বিষয়ে। হবিগঞ্জ জেলায় ২৪টি চা বাগান রয়েছে ১৫,৭০৩ হেক্টর এলাকা জুড়ে। মাধবপুর ও চুনারুঘাট উপজেলায়ই এর সিংহভাগ অবস্থিত। চা শ্রমিকদের প্রায় ৭০-৭৫% নারী এবং ২৫-৩০% পুরুষ। দৈনিক মাত্র ১৮৭.৯৩ টাকা মজুরিতে তারা চা বাগানে কাজ করে থাকে। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, অবিশ্বাস চা শ্রমিক পরিবারগুলোর স্বাভাবিক চিত্র। তবে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখানে আশার কথা হলো কয়েক

বছর আগে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন।

চা চাষ পদ্ধতি

চা সাধারণত দুই মৌসুমে চাষ করা হয়। শুকনা মৌসুম ও বর্ষা মৌসুম। শুকনা মৌসুমের চাষাবাদে খরচ বেশি হলেও মাত্র ১ বছরের মধ্যে চা পাতা সংগ্রহের উপযোগী হয়। এই চাষ পদ্ধতিটিই বেশি জনপ্রিয় কারণ অল্প সময়েই রিটার্ন পাওয়া যায়। রেইন প্লান্টিং এর খরচ কম হয় তবে পাতা সংগ্রহের উপযুক্ত হতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। চা বাগানে কাজের পাশাপাশি চাষাবাদও করে থাকেন অনেকে। তবে এই চাষাবাদ প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে।

সমবায় সমিতি গঠন ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার ০২নং আহম্মদাবাদ ইউনিয়নের নিভৃত পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমু চা বাগান। যেখানে বসবাসকারী অধিকাংশ নারী ও পুরুষ চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা খুব করুণ। উক্ত চা বাগানের কয়েকজন উদ্যমী ও সাহসী ব্যক্তির উদ্যোগে চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠনের জন্য একত্রিত হয়ে পরবর্তীতে সমবায় বিভাগ, হবিগঞ্জ কর্তৃক নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটির নাম 'আমু চা বাগান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.", রেজিঃনং-১৯৩৫, তারিখ : ২৫.০৭.২০২৩ খ্রি.। ঠিকানা : গ্রাম-আমু চা বাগান, ডাকঘর-চান্দপুর বাগান, উপজেলা-চুনারুঘাট, জেলা-হবিগঞ্জ। সমবায়ের নিবন্ধনের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা যেন পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেল এবং ১টি সফল সমবায় সমিতি লি. এর যাত্রা শুরু হলো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সদস্যদের উন্নয়নমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান এবং সদস্যদেরকে মিতব্যয়িতার সুফল শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠন।
- সদস্যদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল সদস্যদের প্রয়োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ হিসাবে বিতরণ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।
- সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইনানুগ উৎস বা কালব (সেন্ট্রাল ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ) হতে অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সেবা প্রদান করা।
- সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যেকোনো সঞ্চয় প্রডাক্ট চালু, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অর্থায়ন এবং সদস্যদের জন্য গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থায়ন এবং টেকসই সমবায় সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে এককভাবে বা শীর্ষ সংগঠন কালব এর সহযোগিতায় বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সমিতির উদ্যোগসমূহ

এনজিও এবং মহাজনদের চড়া সুদের ঋণ থেকে মুক্তি: আমু চা বাগানে প্রায় ১৫/১৬ হাজার পরিবার বাস করে। চা শ্রমিকেরা সাধারণত সাপ্তাহিক হিসেবে মজুরি পেয়ে থাকেন। সমিতি গঠনের পূর্বে সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন এনজিও ও ব্যক্তির নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং সাপ্তাহিক বিল পাওয়ার পরে মহাজন বা এনজিও থেকে চড়া সুদের গ্রহণকৃত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতেন। ফলে আর কোনো টাকা অবশিষ্ট থাকতো না বিধায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হতো। উক্ত সমিতি গঠনের পরে সমিতি থেকে কম সুদে ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। গৃহীত ঋণ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে সমিতির প্রায় ৫২ জন সদস্যের জীবন মান উন্নয়ন ঘটেছে। উক্ত সমিতি গঠনের ফলে সমিতির সদস্যগণ এনজিও ও মহাজন থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। ফলে তারা উপকৃত হচ্ছেন।

সদস্যদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে: চা শ্রমিকরা শিক্ষা ও সচেনতার অভাবে স্বল্প আয়ের অধিকাংশ অংশই বিভিন্নভাবে অপব্যয় করতেন। ফলে তাদের কোনো সঞ্চয় থাকত না। কিন্তু সমিতি গঠনের মাধ্যমে মিতব্যয়ী হয়ে তারা নিয়মিত মাসিক সঞ্চয় প্রদান করছেন এবং তারা সঞ্চয়ী হয়ে উঠছেন। ফলে নিবন্ধনকালীন সঞ্চয় ২২,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৬০,৫১০ টাকা ও শেয়ার ২২,০০০ টাকা থেকে ৪,৩৯,৯৭৯ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা একটি সমিতির শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তিকে নির্দেশ করে।

নিয়মিত ঋণ বিতরণ ও আদায়: আয় বর্ধনমূলক বিভিন্ন খাতে ১০২ জন সদস্যর ১১,৮৫,৯৭৪ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। উক্ত ঋণ সাপ্তাহিক ৪০ কিস্তিতে ১২% সার্ভিস ফিসহ আদায় করা হয়।

ঋণ গ্রহণ ও এর ব্যবহার: সমিতির সদস্যরা লোন নিয়ে প্রধানত কৃষিকাজে ব্যয় করে। যেমন-সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয়। এছাড়া হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, গাভি ও ভেড়া লালনপালনে লোনের টাকা ব্যবহার করে থাকে। সমিতির ঋণখেলাপি শূন্যের কোঠায়। সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ফলে ঋণ প্রদানের ভলিউমও বৃদ্ধি করা সহজ হচ্ছে। প্রতি মাসে সমিতির ৪,০০০-৫,০০০ টাকা লাভ হয়ে থাকে যা ক্রমবর্ধমান।

পূজা সঞ্চয়: পূজা উপলক্ষ্যে কোম্পানি থেকে চা শ্রমিকদের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যারা শ্রমিক নয় তারা কোনো বোনাস পান না। সমিতির অধিকাংশ সদস্য সনাতন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে পূজা সঞ্চয়ের নামে একটি সঞ্চয় চালু করেছেন। উক্ত খাতেও প্রায় ৩,২২,০০০ টাকা তহবিল গঠিত হয়েছে। উক্ত তহবিল সমিতির ঋণ কার্যক্রমে ব্যয়িত হয় এবং উক্ত তহবিলের টাকা সমিতির সদস্যগণ শারদীয় দুর্গাপূজা ও দোল পূর্ণিমায় তাদের সঞ্চিত অর্থ আবেদনের মাধ্যমে উত্তোলন করে ব্যয় করেন। ফলে তারা সমিতি গঠনের পূর্বে অর্থের অভাবে উক্ত পার্বণগুলো সঠিকভাবে উদযাপন করতে পারতেন না। বর্তমানে সমিতি গঠনের ফলে তারা সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন হয়ে পূজা তহবিল গঠন করেন। এই ব্যবস্থায় ইচ্ছামাফিক

সঞ্চয় করা যায় এবং সঞ্চয় উত্তোলন করা যায়। এই সঞ্চয়ের নাম পূজা সঞ্চয় হলেও জমাকৃত টাকা তারা পারিবারিক ও ব্যবসায়িক কাজেও ব্যবহার করে থাকে যা তাদের আর্থিক স্বাধীনতা আনয়ন করেছে।

দোকান সঞ্চয়: আমু চা বাগানটিতে প্রায় ১০০টি দোকান আছে। দোকানদারদের অধিকাংশই সমিতির সদস্য এবং তারা প্রতি মাসে ২০ টাকা শেয়ার ও ৮০ টাকা সঞ্চয় জমা দেয়। ৯০ দিন তথা ৩ মাস পরে সমিতি থেকে লোন নেওয়ার উপযুক্ত হয় যে কেউ।

সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি কার্যক্রম: শুরুতে সদস্য সংখ্যা ২২ জন ছিল। বর্তমানে উক্ত সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৩ জন হয়েছে। উক্ত সমিতির মাধ্যমে আমু চা বাগানের অধিকাংশ পরিবারের সদস্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এবং সকল পরিবারের সদস্যদের কমপক্ষে ১ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সদস্যদের সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সমবায় সমিতিটির অবদান

বাকস্বাধীনতা ও বারগেইনিং ক্ষমতা বৃদ্ধি: সমিতির সম্পাদক মুকেশ কর্মকার উল্লেখ করেন, সমিতি গঠনের পূর্বে চা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে কোম্পানির সাথে আলোচনা করা কঠিন ছিল। কিন্তু এখন শ্রমিকদের নানান বিষয় নিয়ে সমিতি কোম্পানির সাথে কথা বলে শ্রমিকদের দাবি ও সুযোগ–সুবিধা আদায় ব্যবস্থা করা সহজ হয়েছে।

বিরোধের অবসান ও পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়ন: সমিতির অধিকাংশ সদস্য সনাতন ধর্মের। ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ের বসবাস। আর্থিক অনটন ও গোষ্ঠীগত ভিন্নতার কারণে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। কিন্তু সমিতির সদস্য হওয়ার পর থেকে তারা আর্থিকভাবে যেমন স্বাবলম্বী হয়েছে তেমনি তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সমিতির সদস্যগণ অনেক সুসংগঠিত এবং বর্তমানে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। তাদের ছোটখাটো বিরোধ সমিতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে।

সামাজিক কার্যক্রম: এসএসসিতে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য প্রথম বারের মতো প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয় যারা সবাই বাগানের শ্রমিকদের ছেলে মেয়ে। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত উদয়ন উচ্চ বিদ্যলয়সহ আশপাশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারা পড়ালেখা করে থাকে। চা শ্রমিকদের সচেতনতার কারণে বাল্যবিবাহ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। অধিকাংশ ছেলে মেয়েরই এসএসসি পর্যন্ত শিক্ষা জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। খুব কম সংখ্যক উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারে। এর প্রধান কারণ আর্থিক সমস্যা। এত স্বল্প মজুরিতে কাজ করে সংসার চালাতেই যেখানে হিমশিম খেতে হয় সেখানে উচ্চ শিক্ষাতো বিলাসিতা। সমিতির সভাপতি সাধন রুদ্রপাল বলেন, “অর্থের অভাবে যাতে কারো পড়ালেখা বন্ধ হয়ে না যায় সেজন্য চালু করা হয়েছে “শিক্ষা সঞ্চয়”। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সাপ্তাহিক ৫ টাকা করে সঞ্চয় নেয়া হয় এবং অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের বিনা সুদে ঋণ দেয়া হয়। কেউ চাইলে বেশি পরিমাণেও সঞ্চয় করতে পারে।” এছাড়া সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী সমিতি নিট লাভের ৫% অর্থ শিক্ষা তহবিলে জমা রাখতে পারবে। এই অর্থ সমিতির সদস্যদের সমবায় বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক খাতে ব্যবহার করা যাবে।

নারীর ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা: নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় “মাদার কেয়ার” কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাগানে বেড়ে উঠা অনেকেই ডাক্তার ও নার্স হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত আছেন। তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বস্ত্র বিতরণ: অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন যাদের নিজস্ব উপার্জন নেই এবং তাদের দেখভালেরও কেউ নেই তাদের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে পূজার সময় নতুন জামাকাপড় প্রদান করা হয়। তাছাড়া পূজার সময় সমিতির সদস্যদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণ: সমিতির উদ্যোগে প্রতিবছর রাস্তার পাশে, মসজিদ ও মন্দিরের আঙিনায় দেশি ফলজ গাছের চারা রোপণ করা হয় যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি দেশি ফলের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ: সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও ক্যাশিয়ারসহ সমিতির অনেক সদস্য সমবায় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজারে সমিতি ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সমিতি পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। উপজেলা সমবায় অফিসারের মাধ্যমে মৎস্য, কৃষি, প্রাণী সম্পদ, যুব উন্নয়নসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সমিতির সদস্য হওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। ফলে মাঝে মধ্যে গানের আসর বসে বাগানে যা তাদের সম্পর্কগুলোকে আরও নিবিড় করেছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভাসমূহ: সমিতির সম্পাদক মুকেশ কর্মকার বলেন, ‘প্রতি বছর অডিটের ৬০ দিনের মধ্যে মহাসমারোহে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘সমিতিটি সমবায় আইন বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক মিটিংয়ের পাশাপাশি সাপ্তাহিক মিটিংয়েরও আয়োজন করা হয়।

“আমু চা বাগান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.” মাত্র দুই বছর পূর্বে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন লাভ করেছে। নিবন্ধন লাভের পর থেকেই সমবায় আইন ও বিধির আলোকে অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সমিতির উত্তরোত্তর সাফল্যের মাধ্যমে একটি মডেল সমিতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ সমবায় মনোভাবাপন্ন ও মিতব্যয়ী হিসেবে গড়ে উঠছেন।

■ মোঃ রনি মিয়া: জেলা সমবায় অফিসার, হবিগঞ্জ।

SAMABAYA ● Special Issue 2025 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B,
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 48111805 I Editor : Fahmida Akhter Lima